ইসলামি বাংলা সাহিত্য

শ্রীসুকুমার সেন

ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীশেফালিকা রায়
ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ ১৩৫৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৮০

মূল্য ৮·০০

মুদ্রাকর : শ্রীঅবনীকুমার দাস
লক্ষ্মীশ্রী মুদ্রণ শিল্প
৩৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশের কৈফিয়ত

অধুনা-বিস্মৃতপ্রায় যে সাহিত্যধারা একদা বাঙালী জনগণের একটা বৃহৎ অংশের রসপিপাসা মেটাত তার একটি যথাসম্ভব পরিপূর্ণ পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি এই 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য'-এ। 'ইসলামি' নামটি হয়ত সঙ্গত নয়, কেননা রচনা-রচয়িতা-ভাব-ভাষা কোন দিক দিয়েই এই সাহিত্যকে সর্বথা ইসলামি বলা যায় না। আর ইসলাম শাস্ত্র ও তত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধ ছাড়া অপর রচনার পাঠক ও শ্রোতা মুসলমান-সমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। রোমান্টিক কাহিনী-কাব্যে পুরানো মুসলমান কবিদের বরাবরই একচ্ছত্রতা ছিল। কিন্তু কাব্যের বিষয় সর্বদা ফারসী সাহিত্যের অনুগত ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানের এক লেখক ইসলামি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রণয়কাহিনীগুলির একটি ফিরিস্তি দিয়েছেন।

> খারাব করিল কত আশকের তরে
> জেলেখা খারার হৈল ইউসুফ উপরে।
> লায়লি উপরে মজনু হৈল আশক
> সংসার-বিখ্যাত যার আশকি সাদক।
> শিরি ও খোসরু ফরহাদ তিনজনে
> আশক হইয়া মরে প্রেমের কারণে।
> দামন উপরে নল আশক হইল
> মধুমালতীর পরে মনোহর মজিল।
> বদরে-মনির উপরেতে বেনজীর
> হাসেনবানুর পরে আশক মনির।
> হাতেম তাহার লাগি ফেরে বার সাল
> কত মুস্কিলেতে আনে সে সাত সওয়াল।
> গোলে-বকাওলি পরে তাজল-মুলুক
> আশক হইয়া কত ফিরিল মুলুক।
> কামকলা লাগি হৈল কুঙার বেহাল
> সয়ফুল-মুলুক পরে বদিউজ্জামাল।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

১

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী

ভারতক্ষেত্রে মুসলমান-শক্তির পদবী পড়েছিল প্রথমে সিন্ধু-পঞ্জাবে, কেননা ইরানের সঙ্গে এই অঞ্চলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল বহুকাল থেকে—অন্ততপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ দশক থেকে। সিন্ধু-পঞ্জাবে মুসলমান-শাসন রূঢ়মূল হওয়ার অনেক দিন পরে তবে এই বিদেশীদের অভিযান ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে প্রসারিত হতে থাকে। ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তীরহুত-আসাম-উড়িষ্যা ছাড়া আর্যাবর্তের প্রায় সবটা তুর্কী-পাঠানের অধিকারে এসে পড়ল। সিন্ধু-পঞ্জাবে দীর্ঘকাল বসবাস করবার সুযোগ পেয়ে এই স্থানের মুসলমান কবিরা বিদেশীদের মধ্যে সবার আগে ভারতীয় সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই কাজে হাত দিয়েছিলেন তাঁরাই যাঁরা ছিলেন যুগপৎ ফারসী সাহিত্যের মধুকর এবং ভারতীয় সাহিত্যের রসসন্ধানী। বাংলা ছাড়া আর কোনো নবীন-আর্য (অর্থাৎ লৌকিক) ভাষায় আদি যুগের (একাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর) রচনা প্রায় পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালের সংকলনে রক্ষিত হয়ে অল্পবিস্তর রূপান্তর পেয়ে যে দু-একটি ছড়া ও গান আমাদের কাছে পৌঁছেছে সেগুলি প্রধানত মুসলমান কবির রচনা। সুতরাং এ অনুমান করলে খুব দোষ হবে না যে সিন্ধু-পঞ্জাবে লৌকিক ভাষায় সাহিত্য-রচনায় অগ্রণী ছিলেন মুসলমান কবি-সাধকরাই। নূতন ধর্ম-চিন্তার পথেই সমকালীন মুখের ভাষা সাহিত্যে প্রথম গৃহীত হয়ে থাকে।

যে-কালে লৌকিক ভাষার উদ্গম হয়েছিল তখন আর্যাবর্তে সাহিত্যের বাহন-ভাষা ছিল দুটি—সংস্কৃত ও অপভ্রংশ (অবহট্‌ঠ)। সংস্কৃত ছিল সাধু-ভাষা—পণ্ডিতি-শাস্ত্রের ধারক ও সভা-সাহিত্যের বাহক। অপভ্রংশ (অবহট্‌ঠ) ছিল অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত জনগণের প্রিয় গাথা-গীতির সহজ ভাষা। সংস্কৃতমূলক সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান কবিদের পরিচয় কিছু থাকলেও তা খুব গভীর ও ধারাবাহিক ছিল না, তাই বরাবরই হিন্দু কবিদের তুলনায় এঁদের জনগণ-সংযোগ নিবিড়তর ছিল, সুতরাং তাঁরা অপভ্রংশ (অবহট্‌ঠ) কাব্যপদ্ধতিকে উপেক্ষা করেন নি। মুসলমান কবির লেখা একটি অপভ্রংশ কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে কিছুকাল আগে। কাব্যটি "পান্থদূত" গোছের, নাম 'সংনেহয়-রাসয়' (অর্থাৎ

সংস্নেহক বা সন্দেশক রাসক)। কবি ছিলেন মূলতানের অধিবাসী, নাম "অদ্দহমান" অর্থাৎ অব্দর্ রহ্মান, পিতা "মীরসেন" অর্থাৎ মীর্ ইসন। কবি নিজের পরিচয় দিয়েছেন এই কথায়

অণুরাইয়-রইহরু কামিয়-মণহরু
মযণ-মণহ পহ-দীবয়রো
বিরহ-নিরুদ্ধউ সুনহ বিসুদ্ধউ
রসিয়হ রস-সংজীবয়রো।
অই-ণেহিণ ভাসিউ রইমই-বাসিউ
সবণ-সকুলিয়হ অমিয়-সরো
লই লিহই বিয়ক্খণু অথহ লক্খণু
সুরই-সংগি জু বিঅড্ঢো নরো॥

ব্রজবুলিতে অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায়

অনুরাগিক-রতিভর কামিক-মনোহর
মদন মনহ পথ-দীপকর
বিরহি-নিরুদ্ধক শুনহ বিশুদ্ধক
রসিকহ রস-সংজীবকর।
অতিস্নেহি-ভাষিত রতিমতি-বাসিত
শ্রবণ-শকুলিকহ অমিয়-সর
লই লীঢ়ই বিচক্ষণ অর্থহ লক্ষণ
সুরতিসঙ্গী যো বিদগ্ধ নর॥

এক পথিক চলেছে মূলতান থেকে খম্ভাইত্ত। সে পড়ল এক কনকাঙ্গী বিরহিণীর দৃষ্টিপথে। পথিকের গন্তব্য স্থানের নাম শুনে বিরহিণীর চোখে এল জল। সে চোখ মুছে বললে, "খম্ভাইত্ত নামে আমার তনু জর্জরিত হচ্ছে, সেখানে আছেন আমার নাথ, বিরহবর্ধনকারী। অনেককাল হয়ে গেল, নির্দয় আঁর এল না। পথিক, যদি দয়া কর তবে তুচ্ছ কথায় গাঁথা কিছু বাণী দিই প্রিয়ের উদ্দেশে।" পথিক রাজি হল, বিরহিণীর বাণী গাঁথা হল কাব্যটিতে, অন্যূন দেড়-শ দোহাচউপই কবিতায়। শেষে ভরতবাক্য

জেম অচিন্তিউ কজ্জু তসু সিদ্ধু খণহি মহন্তু
তেম পঢ়ন্ত-সুণন্তয়হ জয়উ অণাই-অণন্তু॥

'যেমন তার মহৎ কার্য অনায়াসে অচিন্তিতভাবে সিদ্ধ হল, তেমনি হবে তারও যে এই কাব্য পড়বে ও শুনবে। জয় হোক অনাদি অনন্তের।'

"চন্দ বলিদ্দ" অর্থাৎ চন্দ বরদাই হিন্দী সাহিত্যের আদিকবি বলে বিখ্যাত। কিন্তু এঁর কাব্য, 'পহুবিরায়-রাসউ' বা 'পৃথ্বীরাজ-রাসক' আসলে লেখা হয়েছিল অপভ্রংশে। পরবর্তী কালে কাব্যটির ভাষা স্থানে স্থানে হিন্দীর নবীন বেশ পেলেও অপভ্রংশ মূল কখনো একেবারে তলিয়ে যায় নি। কাব্যটির অপভ্রংশ মূলের অল্পস্বল্প অংশ মিলেছে। চন্দ বর্দাইয়ের কথা বাদ দিলে হিন্দী সাহিত্যের প্রথম কবির মর্যাদা পান দিল্লীর আমীর খুসরৌ (১২৫৪-১৩২৫)। আমীর খুসরৌ ছিলেন বহুভাষাবিদ্। ফারসী কাব্য-সাহিত্যে তাঁর স্থান খুব উচ্চে। হিন্দীতেও ইনি অনেক গান ও কবিতা লিখেছিলেন। অপভ্রংশ কাব্যের একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি ছিল প্রহেলিকা রচনা। খুসরৌ প্রহেলিকা-ছড়াও কিছু লিখেছিলেন। খুসরৌর নামে প্রচলিত এই ধরণের একটি "মুকরনী" অর্থাৎ অনপেক্ষিতার্থ কবিতা উদ্ধৃত করছি।

রহ আবে তব শাদী হোয়
উস বিন দূজা অওর ন কোয়।
মীঠি লাগে রাকে বোল
এ সখি সাজন, না সখি ঢোল॥

'ও আসে তবে শাদী হয়, ও ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই, ওর বোল লাগে মিঠা।' 'সখি, সে কি বল্লভ?' 'না সখি সে ঢোল।'

অপভ্রংশ-রচনার যুগে সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ মিশ্র কবিতার ও ছড়ার প্রচলন ছিল। মুসলমান কবিদের হাতে এই ধরণের ভাষামিশ্র কবিতা বিদেশি ফারসী-আরবী-তুর্কী ও দেশী ও লৌকিক ভাষার সংযোগে নূতন প্রাণ পেলে। বাংলায় এই রীতি নূতন করে চলিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণরাঢ়ের মুসলমান কবিদের এবং তদনুসারে ভারতচন্দ্র রায়ের লেখায়।

লৌকিক ভাষায় সাধনগীতি-পদ্ধতির অনুশীলনে ব্রতী হলেন সূফী সাধক-কবিরা। পঞ্জাবের প্রথম কবি শেখ ফরীদুদ্দীন শকর্গঞ্জ (?-১২৬৭) ছিলেন আমীর খুসরৌর মুর্শিদ শেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার গুরু। শেখ ফরীদুদ্দীনের লেখা একটি অধ্যাত্মগীতি সংকলিত আছে গুরু অর্জুনের আদিগ্রন্থে। গানটিতে সাধক-কবির বিরহিণী-হৃদয়ের তপ্ত উচ্ছ্বাস যেন উপচিয়ে উঠেছে।

প্রাচীন বাংলা চর্যাগীতির অনুবৃত্তি পাওয়া যাচ্ছে কবীরের গানে। একাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর সহজ-সাধনার গঙ্গাধারার সঙ্গে সূফী-সাধনার যমুনা-ধারাকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান সাধক-কবিরা। ঢেণ্ঢণপাদের একটি চর্যাগীতির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হয়েছে কবীরের নামিত একটি গানে। এই গানটি পেয়েছি একটি পুরানো বাংলা পুথিতে মীরার দুটি হিন্দী পদাবলীর এবং জ্ঞানদাস ও মীর ফৈজুল্লা আলীর কয়েকটি ব্রজবুলি পদাবলীর সঙ্গে।

অব কেয়া করে গান গাঁব-কতুয়ালা
শ্ব মাংস-পসারি গীধ রাখওআলা। ধ্রু।
মূসা কি নাও বিলাই কাড়ারী
সোএ মেডুক নাগ পহারী।
বলদ বিয়াওয়ে গাভি ভই বাঞ্ঝা
বাছুরি দুহাওয়ে দিন তিন সাঞ্ঝা।
নিতি নিতি শৃগালা সিংহসনে জুঝে
কহে কবীরে বিরল জনে বুঝে॥

'এখন কি গান করছে গ্রাম-কোতোয়াল? কুকুর দিয়েছে মাংসের পসার, নজর রাখছে গৃধ্র। ইঁদুরের নৌকা, হাল ধরেছে বিড়াল। ব্যাঙ রয়েছে শুয়ে, প্রহরী নাগ। বলদ বিয়ালো, গাই হল বাঁঝা; বাছুর দোয়া হচ্ছে দিনে তিন সন্ধ্যা। নিত্য নিত্য শৃগাল যুদ্ধ করে সিংহের সঙ্গে। কবীর কহে, কম লোকেই বোঝে।'

এই ধারাই সরাসরি চলে এসেছে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বাউল-দরবেশি গানে।

২

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী

অপভ্রংশের যুগে রোমান্টিক-কাহিনীকাব্য ও প্রণয়গাথার বেশ চলন ছিল। এই ধারার জের টেনে এনেছিলেন মুসলমান কবিরা। হিন্দু কবিরা প্রধানত দেব-মাহাত্ম্য-কাহিনী নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন, বিশুদ্ধ প্রণয়কাহিনীর দিকে তাঁদের তেমন নজর ছিল না। হিন্দু কবিদের কাছে লৌকিক সাহিত্য ধর্মসাহিত্যেরই অঙ্গ ছিল। কিন্তু মুসলমান কবিদের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের কোনো আবশ্যিক যোগাযোগ ধরা পড়ে নি, সুতরাং দেবমাহাত্ম্য নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ কাহিনী রচনায় তাঁরা নিরঙ্কুশ ছিলেন। এইজন্যেই হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক-কাহিনী রচনায় মুসলমান কবিরাই অগ্রণী ও একাধিপতি।

এইসব কাহিনী-কাব্যের বিষয় রূপকথাসুলভ রোমান্টিক গল্প মাত্র, সুতরাং এগুলির বস্তু সুনির্দিষ্ট দেশকালের পরিধির বাইরের। তবুও মনে হয় এই ধরণের বিশিষ্ট কোনো কোনো গল্প পূর্ব-ভারতেই বিশেষ করে চলিত ছিল। প্রায় সব কাহিনীতে গোরখপন্থী যোগীর উল্লেখ এই অনুমানের সমর্থক।

সবচেয়ে পুরানো হিন্দী (অবধী) কাব্য হল দাউদের 'চান্দায়ন' বা 'চান্দায়নি' কাব্য।[১] রচনা কাল ৮৭১ হিজরী (অর্থাৎ ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)। কবি তাঁর পোষ্টাদের কিছু পরিচয় দিয়েছেন, আত্মপরিচয় কিছু দেননি। কাহিনী সংক্ষেপে এই: গবরা (অর্থাৎ গৌড়) দেশের এক রাজকন্যা চন্দ্রানী অত্যন্ত রূপসী। পিতা অনেক অন্বেষণ করে উপযুক্ত বংশমর্যাদাবান বর খুঁজে তার বিয়ে দিলেন। বর সাহসী বীর যোদ্ধা কিন্তু খর্বকায় ও নপুংসক। বয়স হলে পর চন্দ্রানী নিজের প্রাসাদে একাকী বাস করতে লাগলেন। তাঁর রূপকাহিনী দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। লোর নামে এক সাহসী যুবক চন্দ্রানীর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয় করে তাকে নিয়ে পালিয়ে গেল। খবর পেয়ে চন্দ্রানীর স্বামী ধাওয়া করলে। লোরের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে মারা পড়ল। চন্দ্রানীর পিতা লোরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে তাকে গবরায় রাজা করে দিলে। ওদিকে ধনী বণিক পুত্র ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল লোরের পত্নী ময়নাকে হাত করবার জন্যে। ময়না

[১] মাতাপ্রসাদ গুপ্ত সম্পাদিত ও আগরা থেকে প্রকাশিত।

স্বামীর অন্বেষণে দূত পাঠালে। লোর খবর পেয়ে বাড়ি ফিরে এল। তারপর দুই পত্নী নিয়ে সুখে বাস করতে লাগল।

এই কাহিনী নিয়ে পরে দু চার জন কবি কাব্য লিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মিয়াঁ সাধন। এঁর রচনা স্বল্পকায়।[১] রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর আগে নয়।

সবচেয়ে পুরানো দ্বিতীয় অবধী কাহিনী-কাব্য (যদি রচনাকাল ১৫১৬ সংবৎ হয়) বোধ করি কবি দামোর রচনা 'লক্ষ্মণসেন-পদ্মাবতী কথা'। কাব্যের রচনারম্ভ-কাল জ্যেষ্ঠ ১৫১৬ (১৪৫৯ খ্রী) অথবা ১৫৭০ (১৫১৩ খ্রী) সংবৎ। কবির পূর্বপুরুষ কাশ্মীরবাসী ছিলেন। কাব্যের পত্তন হয়েছে সরস্বতী-গণেশ-বন্দনায়।

> সুনউ কথা রসলীলবিলাস
> যোগী-করণ [রাজ] বনবাস।
> পদমাবতী বহুত দুখ সহই
> মেলউ করি কবি দামউ কহই।
> সুকবি দামউ লাগই পায়
> হম বর দীয়ো সারদ মায়।
> নমউ গণেশ কুঞ্জর-শেস
> মূসা বাহন হাথ ফরেস।
> লাডু লাবন জস ভরি থাল
> বিঘন-হরণ সমরুঁ দুন্দাল।
> সঁবত পঁদরই সোলোত্তরা মঝার
> জেষ্ঠ বদি নউমী বুধবার।
> সপ্ততারিকা নক্ষত্র দৃঢ় জান
> বীরকথারস করুঁ বখান॥

উপসংহারে কবি গায়নের হয়ে নায়ক-শ্রোতার কাছে "গাই দক্ষিণা স্নার কাপড় পান" চেয়ে ফলশ্রুতি শুনিয়ে ভগবদ্‌-বন্দনা করেছেন।

> বীরকথা সনুহলই জে বলী
> তিহি বিয়োগ নহিঁ একা ঘড়ী।
> হরি জল হরি থল হরি সয়ালি
> হরি কংসাসুর বধিয়ো বালি।

[১] অগরচন্দ নাহটা সম্পাদিত হিন্দী বিদ্যাপীঠ ১৯৫৭)।

> দৈত্যসংহারণ ত্রিভুবন-রাঈ
> সুরতা জে বৈকুণ্ঠা ঠাঈ।
> ইগুনিস বিস্বা এক ন রাজ
> রচই কবিত কবি দামউ সাট।
> ইনি কথা কউ যোহী বীরত্তন্ত্র
> হম তুম্হ জপউ গবরিকাউ কন্ত।

লক্ষ্মণসেন-পদ্মাবতী কাহিনী যে অপভ্রংশ থেকে এসেছিল তার প্রমাণ লৌকিক রচনার মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও প্রাকৃত গাথার প্রক্ষেপ। কাহিনী এই।

গড় সামোরের রাজা হংসরায়ের কন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ংবর-সভা আহূত হয়েছে। সেই সভায় এলেন রাজা ধীরসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন সিদ্ধনাথ যোগীর উপদেশে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের বেশে। তাঁরই গলায় মালা দিলে পদ্মাবতী। সমবেত পাণিপ্রার্থীরা তখন একজোট হয়ে লক্ষ্মণসেনকে আক্রমণ করলে। লক্ষ্মণসেন তাদের পরাভূত করলেন, তারপর আত্মপরিচয় দিলেন। লক্ষ্মণসেন-পদ্মাবতীর বিবাহ হল। কিছুকাল যায়। একদা নিশীথে রাজা লক্ষ্মণসেন স্বপ্ন দেখলেন যোগী তাঁর কাছে পানীয় জল চাইছেন। সকালে রাজা ছুটলেন যোগীর কাছে জল নিয়ে। জল পান করবার আগে যোগী রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিলেন যে তাঁর প্রথম সন্তান জন্মালে যখন তার তিন মাস বয়স হবে তখন তাকে যোগীকে দিয়ে দিতে হবে। রাজা সহজেই রাজি হলেন, কেননা তখন তিনি নিঃসন্তান। যথাসময়ে পদ্মাবতীর ছেলে হল। যখন তার তিন মাস বয়স হল তখন রাজা বেঁকে দাঁড়ালেন। পদ্মাবতী বুঝিয়ে শুঝিয়ে তাঁকে পাঠালেন যোগীর কাছে ছেলেকে নিয়ে। যোগী রাজাকে বললেন শিশুটিকে চার টুকরো করতে। রাজা তাই করলেন। চারটি টুকরো থেকে বেরল ধনুঃশর, অসি, কৌপীনবস্ত্র ও সুন্দরী নারী। রাজা রাজধানীতে ফিরে এলেন কিন্তু রাজ্যশাসনে আর তাঁর মন বসল না। রাজ্য ও রানী ছেড়ে তিনি বনে গেলেন তপস্বীর বেশ ধরে। অবশেষে নিরুদ্দিষ্টভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি পৌঁছলেন সমুদ্রতীরে, চন্দ্রসেনের রাজধানী কর্পূরধারায়। ঘটনাচক্রে সেই সময়ে সমুদ্রতীরে খেলতে এসে রাজপুত্র হরিয়া জলে ডুবেছে। লক্ষ্মণসেন তাকে উদ্ধার করলেন। রাজা চন্দ্রসেন তাঁকে সমাদর করে কাছে রাখলেন। রাজকন্যা চন্দ্রাবতীকে একদিন দেখতে পেয়ে লক্ষ্মণসেন তাঁর রূপে মুগ্ধ হলেন। রাজা চন্দ্রসেনের কানে একথা গেলে লক্ষ্মণসেনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হল।

হত্যার পূর্ব মুহূর্তে লক্ষণসেন আত্মকাহিনী ব্যক্ত করলেন। শুনে রাজার হৃদয় আর্দ্র হল। তিনি কন্যাকে সমর্পণ করলেন লক্ষণসেনের হাতে। চন্দ্রাবতীকে নিয়ে লক্ষণসেন ফিরে এলেন গড় সামৌরে। দু-রানীকে নিয়ে তাঁর দিন সুখে কাটতে লাগল।

কুতবনের 'মৃগাবতী' লক্ষণসেন-পদ্মাবতীর কাব্যের মতো ছোট রচনা নয়, বৃহৎ কাব্য (৩৫০ পাতার পুথি)।[১] ভাষা অবধী বা পূর্বী হিন্দী। জৌনপুরের সুলতান শর্কী হোসেন-শাহের অনুচর ছিলেন কবি। তাঁরই সঙ্গে ইনি বাংলাদেশে পালিয়ে এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন গৌড়-সুলতান হোসেন-শাহের আশ্রয়ে। কাব্যটি লেখা হয়েছিল বাংলা দেশে, গৌড়ে, ৯০৯ হিজরীতে (১৫১২ খ্রী)। কাহিনীও বাংলা দেশের হওয়া সম্ভব।

কুতবন গৌড়-সুলতান হোসেন-শাহের ও তাঁর দরবারের প্রশংসা করেছেন এইভাবে

সাহে হুসেন আহে বড় রাজা
ছত্র-সিংহাসন উনকো ছাজা।
পণ্ডিত অউ বুধবন্ত সয়ানা
পঢ়ে পুরাণ অরথ সব জানা।
ধরম-দুদিষ্টিল উনকো ছাজা
হম সির-ছাহ জীয়ো জগ রাজা।
দান দেই অউ গণত ন আবৈ
বলি অউ করন ন সরবর পাবৈ।
রায় জহাঁ লউ গন্ধ্রয় রহহী
সেবা করহিঁ বার সব চহহী।

চতুর সুজান ভাবা সব জানে অইস ন দেখুঁ কোয়ে
সবা সুনহুঁ সব কান দই শুনি রে দিখাবহু সোয়ে॥

তারপর কাব্যরচনার দিশা

নউ সউ নব জব সংবত অহী।
[মাহ] মোহর্‌রম চান্দ উজিয়ারী
য়হ কবি কহী পুরী সংবারী।

[১] সম্প্রতি মাতাপ্রসাদ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও আগরা থেকে প্রকাশিত।

গাহা দোহা অরেল অরজ
সোরঠা চৌপঈ কই সরজ।
সাস্তর অখির বহুতই আয়ে
অউ দেসী চুনি চুনি কছু লায়ে।
পঢ়ত সুহাবন দীজই কান্
ইহ কে সুনত ন ভাবই আন্।

দোয়ে মাস দিন দস মহী য়হ রে দৌরায়ে জায়ে
য়েক য়েক বোল মোতী জসপুরবা ইক মান চিত লায়ে।

অপভ্রংশের গাহা দোহা অডিল্লা ("অরেল") ও আর্যা ("অরজ") ছন্দের কবিতা ভেঙে সোরঠা-চৌপই করেছেন—কবির এই উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে কাহিনীর মূল পেয়েছিলেন তিনি অপভ্রংশে। কাহিনী এই।

চন্দ্রগিরির রাজা গণপতিদেবের পুত্র কাঞ্চননগরের রাজা রূপমুরারির কন্যা মৃগাবতীর রূপে মুগ্ধ হয়েছে। মৃগাবতী অন্তর্ধানবিদ্যা জানে। অনেক বাধার পর মৃগাবতীর সঙ্গে তার বিবাহ হল। একদিন রাজপুত্র পিতার সঙ্গে দেখা করতে রাজধানী গিয়াছেন এই অবসরে মৃগাবতী গেল পালিয়ে। ফিরে এসে তাকে না দেখে রাজকুমার যোগীর বেশ ধরে বেরিয়ে পড়ল তার অনুসন্ধানে। ভ্রমণক্রমে কুমার পৌঁছল সমুদ্রতীরে এক পার্বত্য প্রদেশে। সেখানে রাক্ষসের কবল থেকে তরুণী রুক্মিণীকে সে উদ্ধার করলে। রুক্মিণীর পিতা মেয়েকে ফিরে পেয়ে তাকে সানন্দে কুমারের হাতে সমর্পণ করলে। নূতন শ্বশুরালয়ে কিছুকাল কাটিয়ে কুমার আবার রাহী হল মৃগাবতীর উদ্দেশে এবং অনেক দুর্গম পথ বেয়ে অবশেষে উপনীত হল মৃগাবতীর দেশে। মৃগাবতী তখন পিতৃরাজ্য শাসন করছিল। কুমারের সঙ্গে মিলন হলে পর মৃগাবতী স্বামীকে সিংহাসনার্ধভাগী করলে। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ-শাসনে বারো বছর কেটে গেল। অবশেষে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধানে রাজা গণপতিদেব দেশে বিদেশে লোক পাঠালেন। একজন দূত রুক্মিণীর দেশে গিয়ে কুমারের সন্ধান পেলে এবং সেই সূত্র ধরে মৃগাবতীর দেশে এল। কুমার মৃগাবতীকে নিয়ে চন্দ্রগিরি রওনা হল। পথে বিরহিণী রুক্মিণীকে সঙ্গে তুলে নিলে। দেশে ফিরে সুখে দিন কাটতে লাগল। একদিন শিকারে গিয়ে কুমার হাতী থেকে পড়ে মারা পড়ল। দুই রানী সহমরণে গেল।

"হাসির মায়ামৃগীর পিছে নয়ননীরে" ভাসার এই গল্পটি বেশ পুরানো। মহাযান বৌদ্ধ বিনয়পিটকে সুধন-মনোহরা কাহিনী দ্রষ্টব্য।[১]

কবি কুতবন সুফী সাধক ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন বিখ্যাত সুফী পীর শেখ বুরহান চিশ্‌তী। কাব্যের উপক্রমণিকায় কবি গুরুর উদ্দেশে নতি জানিয়েছেন

শেখবুঢ়ন জগ সাচা পীরু
নাঁব লেত সুধ হোত সরীরু।
কুতবন নাম লেই পা ধরে
সরবর দী দুহ জগ নীর ভরে।
পাছলে পাপ ধোয়ই সব গয়ে
ঝরহি পুরানে অউ সব নয়ে।
নই কই ভয়া আজ অউতারা
সব সোঁ বড়া সো পীর হমারা।

মৃগাবতী-কাহিনীকে কুতবন কতকটা আধ্যাত্মিক রূপকের আধাররূপে ব্যবহার করেছিলেন। এই পথে আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন শেখ বুরহানের প্রশিষ্য মালিক মুহম্মদ জায়সী (?-১৫৪২)। জায়সীর পদ্মাবতী কাব্য শুধু অবধী সাহিত্যের নয়—সমগ্র নবীন-ভারতীয় সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। কুতবনের মৃগাবতীর অনুসরণ করেই জায়সী তাঁর উৎকৃষ্ট রূপক-কাব্যটি রচনা করেছিলেন। এই দুজন সুফী কবির রচনা বাংলাদেশে অজ্ঞাত ছিল না। জায়সীর কাব্য বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন সৈয়দ আলাওল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে। কুতবনের কাব্যের অনুসরণ হয়েছিল হিন্দু ও মুসলমান কবির দ্বারা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

অপভ্রংশ সাহিত্যের একটি বিশুদ্ধ প্রণয়কাহিনী, মাধবানল-কামকন্দলা কথা, আর্যাবর্তের প্রায় সর্বত্র আদৃত হয়েছিল। কাহিনী সামান্যই। পুষ্পবতীর রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পুষ্পবটু মাধবানল ছিল রূপে কন্দর্প বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। মাধবানলের প্রতি রাজধানীর তরুণীদের পক্ষপাত জেনে তাদের স্বামীরা রাজার কাছে প্রার্থনা করলে মাধবানলকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে। রাজাও বোধ করি নিজ শুদ্ধান্তঃপুরের জন্যে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই মাধবানলকে নির্বাসন দিতে বিলম্ব হল না। পুষ্পবতী ছেড়ে মাধবানল চলে এলেন কামসেনের রাজধানী কামাবতীতে। সেখানকার রাজসভার নটীমুখ্যা ছিল সুন্দরী কামকন্দলা।

[১] শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত সম্পাদিত 'দি গিলগিট ম্যানাস্‌ক্রিপ্টস্‌' দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

কামকন্দলা রাজসভায় নৃত্য করছে এমন সময় মাধবানল সভা-দ্বারে হাজির হল। দূর থেকে অল্প কিছুক্ষণ নাচ দেখে মাধবানল প্রতীহারকে ডেকে বললে, বারো জন বাজিয়ের মধ্যে যে লোকটি পুবমুখে বসে বাজাচ্ছে তার হাতের বুড়ো আঙুল কাটা বলে তাল কাটছে, রাজাকে এই কথা বলো গিয়ে। রাজা দেখলেন ঠিকই তো। মাধবানলকে ডাকিয়ে এনে সমাদর করে কাছে বসালেন। রূপবান্ সমঝদার গুণীর আগমনে উৎফুল্ল হয়ে কামকন্দলা তার দুর্ঘট নৃত্যকৌশল দেখাতে লাগল। মাথায় জলভরা কলসী নিয়ে হাতে গুলি লুফতে লাগল, সেই সঙ্গে মুদ্রা দেখাতে লাগল, নাচতে নাচতে পায়ে তাল দিতে থাকল, মুখে গান গেয়ে চলল, চোখে কটাক্ষবর্ষণ করতে লাগল। এমন সময় ভ্রমর উড়ে এসে তার বুকে বসল। তবুও নাচ-গান-তাল-মুদ্রা-কটাক্ষ মুহূর্তের জন্যেও ভঙ্গ হল না, কামকন্দলা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ভ্রমরকে তাড়িয়ে দিলে। এই চাতুর্য মাধবানল ছাড়া কেউই লক্ষ্য করলে না। নৃত্যশেষে সাধুবাদ উঠল না দেখে মাধবানল কিছুক্ষণ আগে রাজার কাছে যে "পঞ্চাঙ্গ প্রসাদ" লাভ করেছিল তা কামকন্দলাকে পেলা দিয়ে দিলে। কামকন্দলা অঞ্জলি পেতে আশীর্বাদী নিয়ে বললে, হে নিখিলবিদ্যাপারগ, তোমার সমান কলাভিজ্ঞ আর তো কাউকে দেখলুম না। রাজার হল রাগ, মাধবানলের প্রতি হুকুম হল অবিলম্বে সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে। রাজসভা থেকে মাধবানল গিয়ে উঠল কামকন্দলার বাড়িতে। সেখানে দুজনের মনের কথা বিনিময় হল। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবার জো নেই। মাধবানল আবার বেরিয়ে পড়ল পথে। এ পথ নিয়ে গেল তাকে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে। এক ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হয়ে ভোজন সেরে মাধবানল কামকন্দলাকে চিঠি লিখলে প্রণয় নিবেদন করে। সন্ধ্যার পর নগরবাহিরে মহাকালের মন্দিরে গিয়ে এককোণে শুয়ে রইল। বিরহীর চোখে ঘুম আর আসে না। কি করে, অন্তরের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে মাধবানল কামকন্দলার নাম নিয়ে কবিতা রচনা করে দেওয়ালের গায়ে লিখে রাখলে। সকালে ঠাকুর দেখতে এসে এই কবিতা নজরে পড়ল রাজার। তিনি খোঁজ করতে লাগলেন রচয়িতা কে। যখন কেউই খবর আনতে পারলে না তখন তিনি নিযুক্ত করলেন গণিকা ভোগবিলাসিনীকে। সে মহাকাল-মন্দিরে ছদ্মবেশে গিয়ে রাত্রিতে মাধবানলের পাশে শুয়ে ঘুমন্ত বিরহীর মুখে উচ্চারিত প্রিয়া কামকন্দলার নাম জেনে নিলে। খবর নিয়ে রাজা মাধবানলকে ডেকে পাঠিয়ে নানারকমে বোঝাতে লাগলেন বেশ্যানারীর মোহ ত্যাগ করতে। মাধবানলের মন অবিচল দেখে অগত্যা রাজা চললেন কামকন্দলার কাছে। রাজাকে

বিক্রমাদিত্য বলে চিনতে পেরে কামকন্দলা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। টেনে নিতে গিয়ে পা কামকন্দলার বুকে ঠেকল। কামকন্দলা ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণকে পদাঘাত করলেন। রাজার তখন হৃদয়ঙ্গম হল মাধবানলের প্রতি কামকন্দলার কী গভীর অনুরাগ। তবুও তিনি এই অনুরাগ কল্যাণজনক ভাবতে পারলেন না। মিথ্যা করে কামকন্দলাকে বললেন যে কে এক মাধবানল এক নারীর অনুরাগে পড়ে তার বিরহে মারা গেছে। এই কথা শোনামাত্র কামকন্দলার প্রাণবিয়োগ হল। পরে দেখে শুনে মাধবানলেরও মৃত্যু হল। হঠকারিতার অনুতাপে দগ্ধ হয়ে বিক্রমাদিত্য বনে গেলেন আত্মহত্যা করতে। বেতাল তাঁকে বাধা দিলে এবং পাতাল থেকে অমৃত এনে প্রণয়ী দুজনকে বাঁচিয়ে তুললে। রাজার মুখরক্ষা হল। উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তন করে বিক্রমাদিত্য কামসেনকে বলে পাঠালেন কামকন্দলাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে। কামসেন রাজি হল না। বিক্রমাদিত্য তাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিলেন। মাধবানল-কামকন্দলার বিবাহ হল। তারা উজ্জয়িনীতে সুখে বাস করতে লাগল বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে।

মাধবানল-কামকন্দলার কাহিনীতেও একটু রূপকের ছোঁয়া আছে। তার পরিচয় নায়ক-নায়িকার নামেই রয়েছে। মধু-ঋতুর তাপে কাম হয় উদ্দীপিত।

লৌকিক সাহিত্যে, গুজরাটী-হিন্দীতে, মাধবানল-কামকন্দলা কাব্য অনেকেই লিখেছিলেন। তার মধ্যে পুরানো হলো তিনখানি, গণপতির 'মাধবানল-কামকন্দলা দোহা', কুশললাভের 'মাধবানল-কামকন্দলা চৌপাঈ' ও আলমের 'মাধবানল-কথা'। গণপতি ছিলেন গুজরাটী কায়স্থ। এঁর কাব্যের রচনাকাল ১৫৮৪ সংবৎ (১৫২৭ খ্রী)। সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশে লেখা রচনার মধ্যে আনন্দধরের কাব্যই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম।

আলম তাঁর কাব্য লিখেছিলেন হিন্দীতে। রচনাকাল ৯৯১ হিজরী (১৫৮৪ খ্রীঃ)। কাব্যের উপক্রমে দিল্লীপতি শাহ জলাল আকবরের ও মন্ত্রী রাজা টোডরমল্লের প্রশংসা আছে।

> জগপতি রাজ কোটি যুগ কীজৈ
> শাহ জলাল ছত্রপতি কহীজৈ।
> দিল্লীয়পতি অকবর সুরতানা
> সপ্ত দ্বীপমে জাকী আনা।...

> ধর্মরাজ সব দেশ চলাবা
> হিন্দু তুরক পন্থ সব লাবা।
> আগে নেউ মহামতি মন্ত্রী
> নৃপ রাজা টোডরমল ক্ষত্রী।...
> সন নৌ সৌ ইক্যানৱৈ আই
> করো কথা অব বোলো তাই।
> কহো বাত সুনৌ অব লোগ
> করো কথা সিংগার-বিয়োগ।
> কছু অপনী কছু পরকৃতি চোরৌ
> জথা সকতি করি অচ্ছর জোরৌ।
> সকল সিংগার-বিরহকী রীতি
> মাধো-কামকন্দলা-প্রীতি।
> কথা সংস্কৃত সুনি কছু থোরী
> ভাষা বান্ধি চৌপই জোরী।
> মাধোনল সব-গুণ-চতুর কামকন্দলা জোগ
> করই কথা আলম সুকবি উতপতি-বিরহ-বিয়োগ ॥

কবির স্বীকৃতিতেই প্রকাশ যে সংস্কৃত-প্রাকৃত তাঁর অজানা ছিল না।

জেসলমীর-নিবাসী কুশললাভ প্রাচীন রাজস্থানী ভাষায় 'ঢোলা-মারবনরী চৌপঈ'-ও লিখেছিলেন যাদব রাঁওল কুমার হররাজের চিত্ত-বিনোদনের জন্যে। এই কাব্যের রচনাকাল ১৬০৭ সংবৎ (১৫৫০ খ্রী)। মাড়বারের রাজা পিঙ্গলের বিবাহ হয়েছিল জালোরের অধীশ্বর সামন্তসিংহের সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা উমাদেঈর সঙ্গে। পিঙ্গল-উমাদেঈর সন্তান হল মারবনী (=মরুবাট-কন্যা)। নলবর-গড়ের রাজা নলের পুত্র ঢোলার সঙ্গে তার বিবাহ হল পুষ্করে। কন্যাকে পিতৃগৃহে রেখে নলবর-গড়ে ফিরবার পথে নল পুত্রের আবার বিবাহ দিলে মালব-রাজকন্যার সঙ্গে। ঢোলা-মালবিকা সংসার করতে লাগল, ওদিকে মরুবাটনিকা বিরহজ্বালায় জ্বলছে। অবশেষে সে দূত পাঠালে স্বামীর উদ্দেশ্যে। তার পর যথারীতি মিলন।

এইটুকু ঢোলা-মারবনী কাহিনী। কাব্যটির মূল ছিল অপভ্রংশে। কুশললাভ মাঝে মাঝে অপভ্রংশ দোহা ও গাহা উদ্ধৃত করেছেন। এবং শেষে বলেছেন

> দুহা ঘণা পুরাণা অছই
> চউপঈ-বন্ধ কীয়া মই পছই।

পূর্ব-ভারতেও মাধবানল-কামকন্দলার কাহিনী অজ্ঞাত ছিল না। আনন্দধরের কাব্যের বাংলা পুথি যথেষ্ট পাওয়া গেছে। বিদ্যাপতির নামেও একটি ছোট সংস্করণ মিলেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে কবি 'দ্বিজ' ধনপতি নেপালে বসে এই বিষয়ে একটি নাটগীত লিখেছিলেন ব্রজবুলিতে।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রণয়কাহিনীকাব্য হচ্ছে বিদ্যাসুন্দর। একজন ছাড়া সব বিদ্যাসুন্দর-কবিই ছিলেন হিন্দু। সুতরাং তাঁদের হাতে কাব্য-কাহিনী দেবী-মাহাত্ম্যের ফ্রেমে বাঁধাই হয়েছে। বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর প্রথম কবি 'দ্বিজ' শ্রীধর কবিরাজ গৌড়-সুলতান নুসরৎ-শাহার পুত্র যুবরাজ ফীরুজ-শাহার চিত্তবিনোদনের জন্য কাব্যরচনা করেছিলেন। মনে হয় জৌনপুরের হোসেন-শাহা শর্কীর অনুচর কবিদের দ্বারাই এই প্রণয়কাহিনী বাংলাদেশে প্রচারিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যাসুন্দরকাহিনীর বিভিন্ন রূপ চলিত ছিল সংস্কৃতে। বাংলা দেশে প্রচলিত কাহিনীতে কিছু স্বতন্ত্রতা আছে।

প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি বটে তবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু আভাস আছে। মৃচ্ছকটিকের শেষ অঙ্কে সুন্দরের দশাপ্রাপ্ত চারুদত্তের এই উক্তি তার প্রমাণ

মযি মৃত্যুবশং প্রাপ্তে বিদ্যেব সমুপাগতা।

বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের একমাত্র মুসলমান কবি সাবিরিদ খান বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

৩

দৌলৎ কাজী

পাঠানরাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়-দরবারের নির্বাপিত দীপশিখা বহুগুণিত হয়ে জ্বলে উঠল বাংলা-সীমান্তের সামন্ত-রাজসভাগুলিতে—কামতা-কামরূপে, শ্রীহট্টে-ত্রিপুরায়, দরঙ্গ-কাছাড়ে, চাটিগাঁ-রোসাঙ্গে, মল্লভুম-ধলভূমে। চাটিগাঁয়ে হোসেন-শাহার প্রতিরাজ লস্কর পরাগল-খান ও তাঁর পুত্র নুসরৎ-খান গৌড়-দরবারের অনুরূপ সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। যোগ্য কবি-পণ্ডিত না থাকায় সে চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে তেমন ফলবান্ হয় নি। কিন্তু চাটিগাঁয়ে ও রোসাঙ্গে (অর্থাৎ আরাকানে) পরবর্তীকালে যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছিল তা সম্ভব হত না পরাগল-নুস্রতের পূর্বতন প্রচেষ্টা বীজরূপে না রয়ে গেলে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবির প্রথম সাক্ষাৎ মেলে চাটিগাঁ-রোসাঙ্গেই।

বাংলায় হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যধারার ভগীরথ হচ্ছেন রোসাঙ্গ-দরবারের দুজন সভাকবি, দৌলৎ কাজী ও আলাওল। দৌলৎ কাজী বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, পুরানো বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী কবিদের অন্যতম তিনি। তাঁর একমাত্র কবিকৃতি হল অসমাপ্ত—পরে আলাওল কর্তৃক সম্পূর্ণিত—'লোর-চন্দ্রানী', পাঁচালী-কাব্য। রোসাঙ্গের রাজা শ্রীসুধর্মার লস্কর-উজীর আশরফ-খানের অনুরোধে দৌলৎ কাজী হিন্দী (অর্থাৎ অবধী) মূল অনুসরণ করে কাব্যকরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। শ্রীসুধর্মার রাজ্যকাল ১৬২২-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। কাব্যের রচনাকালও এর মধ্যে পড়ে। রচনাসমাপ্তির আগেই দৌলৎ কাজীর মৃত্যু হয়েছিল। দৌলৎ কাজী ছিলেন সূফী কবি-সাধক। এঁর পোষ্টা আশরফ-খানও "হানাফী মোঝাব ধরে চিশ্‌তি খান্দান"।

কাব্যের প্রথমে আল্লার ও রসুলের বন্দনা। তার পর রোসাঙ্গের রাজার সুশাসনের প্রশংসা

রাজ্য সব উপশম কৈল সুবিচার
কাকে কেহ না হিংসে উচিত ব্যবহার।

মধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি
রাজাভয়ে মাতঙ্গে না যায় তারে ঠেলি।
বিধবা নির্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্নভার
ভীম সম বলিয়া না করে বলাৎকার।
সীতা সম সুন্দরী সে যদি রহে বনে
রাজাভয়ে না নিরীক্ষে সহস্রলোচনে।…
মহামত্ত ঐরাবতে দেখি কীর্ত্তিযশ
শ্বেতরূপে সুধর্মের হৈল পদবশ।

তারপর 'ধর্ম্মপাত্র' মহামাত্য আশরফ-খানের স্তুতি

শ্যামতনু যুক্তিমন্ত বচন মিষ্টতা
শুদ্ধমতি ছোট বড় লোকেত ইষ্টতা।
দেশান্তরী প্রবাসী পান্থক বানিজার
দেশে দেশে কীর্ত্তিযশ বাখানে যাহার।
উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ
আচি কুচি মচিন পাটনা আদি দেশ।…
নৃপতির সম্পাশে বৈসেন্ত দিবারাতি
যথা যায় রাজা তথা চলেন্ত সঙ্গতি।

একদিন রাজার মন গেল বিপিনবিহারে। অমনি চতুরঙ্গ সেনা সাজিয়ে রাজা ধরলেন নৌকায় বারো দিনের পথ।

দ্বাদশ দিবস পন্থ নৌকায় চলিতে
কৌতুকে চলেন্ত রাজা নিকুঞ্জ খেলিতে।
নানাবর্ণ নৌকা সব দেখি চারি পাশে
নব শশিগণ যেন জলে নামি ভাসে।
দুই-সারি সে নৌকা ভাসয়ে নানা রঙ্গে
আরোহিল নৃপ সভা আশরফ সঙ্গে।
দশ-দিন পন্থ নৌকা একদিনে যায়
সুবর্ণের হংস যেন লহরি খেলায়।…
খেলিতে খেলিতে রাজা গেল কুঞ্জবন
সঙ্গী আশরফ-খান আদি পাত্রগণ।…

বনপাশে নগর এক দ্বারাবতী নাম
কৃষ্ণের দ্বারিকা যেন অতি অভিরাম।
তথাতে রচিয়া সভা রহিলা নৃপতি
ময়ূরগঠন যেন সভার আকৃতি।…
যাহার যেমন যুক্ত শিবির রচিয়া
তাহাতে রহিল সৈন্য আনন্দ করিয়া।

চার মাস কেটে গেল, রাজা রাজধানীতে ফেরবার নামও করেন না। আশরফ-খান ফিরে এলেন রাজার অনুমতি নিয়ে এবং নিজের সভা জাঁকিয়ে বসলেন। তত্ত্বকথায় কাব্যগীতিতে সে সভা হল মুখর।

আরবী ফারসী নানা তত্ত্ব-উপদেশ
বিবিধ প্রসঙ্গ-কথা আছিল বিশেষ।
গুজরাতী গোহারী ঠেট ভাষা বহুতর
সহজে মহন্ত-সভা আনন্দ-নিয়র।

একদিন মহামাত্যের মনে ইচ্ছা জাগল "শুনিতে লোরক-রাজ ময়নার ভারতী"। তিনি কবি দৌলৎকে বললেন, ঠেট ভাষায় দোহা-চৌপই শুনলুম, কিন্তু সাধারণ লোক সবাই তো গাঁওয়ারি ভাষা বোঝে না, অতএব গল্পটি দেশি ভাষায় পাঁচালীর ছাঁদে লেখ যাতে সব লোকে বোঝে ও আনন্দ পায়। এই নির্দেশ পেয়ে দৌলৎ কাজী "পাঞ্চালীর ছন্দে ময়নার ভারতী" কহিলেন।

তারপর কাহিনীর আরম্ভ।

রাজার কুমারী এক নামে ময়নাবতী
ভুবনবিজয়ী যেন জগৎপার্বতী।
কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ।
কাঞ্চনকমল মুখ পূর্ণশশী নিন্দে
অপমানে জলেতে প্রবেশে অরবিন্দে।
চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে
মৃগাঞ্জন শরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে।…
প্রিয়বাদী পতিব্রতা সুলাস সুমতি
প্রত্যক্ষ-শঙ্কর সম সেবে নিজ পতি।

সর্বকলাযুতা সতী নূতন যৌবন
স্বামীর লোরক নাম নৃপতিনন্দন।
নানা গুণে বিশারদ লোরক দুর্জয়
বিচক্ষণ বলবন্ত সাহসে নির্ভয়।
অন্যে-অন্যে দোহ চিত্তে প্রেমের মুকুল
তিলেক বিচ্ছেদে হৈলে দোহান আকুল।

কিন্তু পুরুষের মন বোঝা দায়।

আচম্বিতে মতি হৈল লোরক-নৃপতি
ছাড়িয়া রতন-হার গুঞ্জাতে আরতি।

মহাদেবীর হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে লোরক চলল বিপিনবিহারে, এবং শ্রীসুধর্মার মতো কাননকুটীরে চারু প্রাসাদ ও ললিত মন্দির গঠন করে খেলাধূলায় নিত্য মহোৎসবে দিন কাটাতে লাগল পাত্রমিত্রের সঙ্গে। আর ময়নাবতী রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে বিরহে পুড়তে লাগল।

লোরকের কাননসভায় একদা এক যোগীর আগমন হল। তার হাতে এক সুবর্ণের ঘট তদুপরি এক বিচিত্র 'পোতলির পট'। যোগীর দৃষ্টি সর্বদা সেই সুন্দরীর প্রতিকৃতির উপর নিবদ্ধ। প্রশ্ন ক'রে লোরক জানলে সে পট মোহরা-রাজার দুহিতা চন্দ্রানীর।

পশ্চিমেতে এক রাজ্য আছেত গোহারি
তাহাতে মোহরা নামে রাজ্য-অধিকারী।
সুর-বংশ ধনুর্ধর বীর অবতার
জামাতা বামন বীর দুর্জয় তাহার।
রাজসুখ ভুঞ্জয় বসিয়া বৃদ্ধকালে
বামন বীরের বাহুদর্পে ভূমি পালে।...
খর্বরূপ হই বীর দীর্ঘ করে নাশ
বামনবিক্রম যেন বলির উদাস।...
সর্বগুণে যৌবনসম্পূর্ণ বীর্যবল
রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল।
তাহার রমণী নৃপ মোহরা-কুমারী
রূপে চন্দ্র সম নহে সে চান্দ-গোহারি।...

সে রূপের কাহিনী প্রসরে নানা দেশ
রাজা-সকলের কর্ণে অপূর্ব বিশেষ।
অপূর্ব সে রূপ যদি শুনয়ে শ্রবণে
মানস না হয় শান্ত না দেখি নয়নে।
তেকারণে ইচ্ছে লোক সে রূপ দেখিতে
শ্রবণনয়ন মাঝে বিবাদ খণ্ডিতে।...
নগর ভ্রময়ে কন্যা বৎসরে দু-বার
সকলের মনোবাঞ্ছা কন্যা দেখিবার।
পরব-সময় যদি হৈল উপস্থিত
দেবস্থানে যায় কন্যা দেব-সমুদিত।..
মহাবীর বামন সৃজিলা প্রজাপতি
নারীসঙ্গে রতিরসহীন মূঢ়মতি।
মাসেকে না চাহে নেউটিয়া নিজ নারী
বনক্রীড়া করে নিত্য যেন বনচারী।
প্রতি-নিতি মহাবীরে কানন ভ্রমিয়া
শার্দূল মহিষ মৃগে আনেন্ত মারিয়া।
বন ভ্রমি আইসে যদি দুর্জয় বামন
প্রতিদিন রাজদ্বারে বাহিরে শয়ন।

বহুদিন নারীসঙ্গবিবর্জিত লোরকের চিত্ত বিচলিত হল চন্দ্রানীর কথা শুনে। যোগীকে সঙ্গে নিয়ে সে গোহারি দেশে গেল। ছ'মাস কেটে গেলে চন্দ্রানী-দর্শনার্থী রাজাদের ডাক পড়ল।

অব্দে দুইবার অভ্যাগত সকলেরে
সভা রচি বৃদ্ধরাজে নিমন্ত্রণ করে।

সাজসজ্জা ক'রে লোরক রাজসভায় গেল। প্রাসাদ-গবাক্ষ থেকে চন্দ্রানী তাকে দেখে মুগ্ধ হল। আরও ছ'মাস যায়।

চিন্তে যুগী সনে রাজা বৎসর পূরিল
তথাপিহ কুমারীদর্শন না মিলিল।
অনুশোচে লোরক পোতল-রূপ হেরি
লভ্যের কারণে মুই হারাইলুঁ কড়ি।...

দৈবে মোর হৈল হেন দুই-কুলহানি
তেজি আইলুঁ ময়নাবতী না পাইলুঁ চন্দ্রানী।
চন্দ্রানীর রূপ ভাবি লোরক ফাফর
বিষ্ণারসে মগ্ন যেন বৈদেশি সুন্দর।

চন্দ্রানীর মনের কথা ধাই জেনে নিয়ে লোরককে চন্দ্রানীর রূপ দেখিয়ে দিলে দর্পণে রাজসভার মধ্যে। দেখে লোরক মূর্ছিত হল। ধাই তাকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলে। যোগী-রূপ ধরে লোরক দেবমন্দিরে গেল। সেখানে দুজনের দৃষ্টিবিনিময় হল। নিশীথে লোরক চন্দ্রানীর গৃহদুর্গে হানা দিলে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে। দুজনের মিলন হল। বামন গিয়েছিল শিকারে। তার ফেরবার সময় আসন্ন হলে লোরক চন্দ্রানীকে নিয়ে বনপথে পালাল। বামন ফিরে এসে ব্যাপার বুঝলে এবং সসৈন্যে লোরককে ধাওয়া করলে। দু-বীরের দেখা হল বনের মধ্যে। যুদ্ধে বামন মারা পড়ল। এদিকে চন্দ্রানীকে কাটল সাপে। এক সাধু তাকে বাঁচিয়ে তুললে। এমন সময় বুড়ো রাজা দূত পাঠিয়ে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

কুমারকে অভিষেক করি নিজ দেশ
আপনে রহিলা বৃদ্ধরাজ গুরু-ভেশ।...
হেনমতে পৃথিবী পালয়ে লোর-পতি
কতকালে বৃদ্ধরাজ পাইল স্বর্গগতি।
বৃদ্ধের মরণে হয় যুবকের আশ
হেমন্ত-অন্তরে যেন বসন্ত উল্লাস।
কপট সংসারমায়া কি বুঝিতে পারি।
পিতৃকে মারিয়ে পুত্রে করে অধিকারী।
চারি যুগ বৃদ্ধ-পতি যুবতী আকার
প্রতিদিন এক স্বামী করয়ে সংহার।
তাহাকে গ্রাসিয়া পুনি আন স্বামী বরে
পাপিনী থাকিনী কাকে দয়া নাহি করে।

গোহারিতে রাজা হয়ে লোরক চন্দ্রানীর সঙ্গে সুখে রাজ্য করছে। ওদিকে বিরহিণী ময়নাবতী সর্বদা দেবপূজায় ও পতির মঙ্গলচিন্তায় নিরত।

সে কাহিনী অন্তঃপুরে রম্ভা-সরোবর তীরে
শুচিরুচি কুসুম-উদ্যান

তাহাতে নির্জনে নারী আরাধে শঙ্করগৌরী
সর্বহিত স্বামীর কল্যাণ।
চাহন্ত রাজ্যের ভাল টুটউক জঞ্জাল
দ্বিজগুরুজন হৌক শান্ত
এই বর মাগে নারী গৌরীপদ অনুস্মরি
সত্বরে মিলউক নিজ কান্ত।

পতিবিরহিণী ময়নাবতীর রূপগুণের কাহিনী দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক রাজা-রাজড়া-ধনী এসে জুটল মধুগন্ধলুব্ধ ভ্রমরের মতো। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছাতন। তার উদ্যোগ হল বেশিরকম। সে রত্না মালিনীকে ময়নাবতীর শৈশবধাত্রী সাজিয়ে দূতীগিরিতে নিযুক্ত করলে। মালিনীর কপট স্নেহরসে মুগ্ধ হয়ে ময়নাবতী তপস্বিনীর বেশ ছেড়ে দিলে।

কুটনী-বচন শুনি ধাই হেন সত্য জানি
নাপিত বোলাই ততক্ষণে
সুগন্ধি কুসুম্ভ রঙ্গে মার্জন করাইল অঙ্গে
স্নান করাইলা সখীগণে।
মনে ভাবে সে মালিনী মোর বুদ্ধি হস্তে রানী
এবে সে যাইব কোন স্থান
উপকথা নানাবর্ণে ভোলাই কহিমু কর্ণে
হৃদে যেন জাগে পঞ্চবাণ।...

তবে ময়নার সঙ্গ না তেজে মালিনী
কপটপ্রবন্ধে কহে নানান কাহিনী।
কৃত্যাসূত্রে বাক্যপুষ্প গুথিয়া কপটী
গরল পীলায় যেন অমৃত লেপটি।

মালিনী সর্বদা এই কথা ময়নাবতীর কানে জপতে লাগল
হেলায় যৌবন যাইব পাছে পাইবা শোক
পুরুষ মিলাই দিমু ভুঞ্জ সুখভোগ।

ময়নাবতী বিরক্ত হয়ে বললে
মোহর ভ্রমরা স্বামী জগৎপূজিত
গোময়ের কীট কোথা ভ্রমরা-তুলিত।

তার "সতীত্ববাণী" শুনে মালিনী ভাবলে, সোজা পথে যখন হল না তখন বাঁকা পথে চলতে হবে,

ঋতুমাস পরবেশ উপহাস্য ছলে
কহিমু সুন্দরী যেন শুনে কুতূহলে।

নববর্ষার মেঘ ঘনিয়ে এসেছে প্রথম আষাঢ়ে। মালিনী বর্ষার সুখ-সম্ভোগ বর্ণনা করে শেষে ময়নাবতীর দুঃখ ভেবে কান্না জুড়লে সুহই রাগ ভেঁজে

শুনহ উকতি করহ ভকতি
মানহ সুরতি রাই
নাগর সুজন মিলাইয়া দেওঁ
রাধার কোলে কানাই।

ময়নাবতীর উত্তর আসাবরী রাগে

আই ধাই কুজনী কি মোকে শুনাওসি
বেদ-উক্তি নহে পাটং
লাখ উপায়ে মিটাতে কে পারয়ে
যো বিধি লিখিছে ললাটং।
না বোল না বোল ধাই অনুচিত বাণী
ধরম না চাহসি তেজি সতীত্বমতি
লোর-প্রেমে করাওসি হানি।...
দুরন্ত দুর্মতি দূতীপনা দূর কর,
চিন্তহ মোহর কল্যাণং
কাজী দৌলতে ভনে দাতা মনোভব মনে
শ্রীযুত আশরফ-খানং॥

শ্রাবণ মাসে মালিনী জপতে লাগল

আনন্দের হিল্লোলে দম্পতী সব দোলে
কর্মহীন বিরহিণী কান্ত নাহি কোলে।
এতেক বুঝিউ তুমি কর্মহীন নারী
দুর্ভাগ্যের মত বঞ্চ রাজার কুমারী।
অবধি গোঙাইয়া গেল শুন ময়নাবতী
এই ঋতু পতি তোর না আইল সম্প্রতি।

তারপর শ্রী রাগিণীতে জুড়ল পদাবলী গান,

কামিনী মরমে মোহর বলবান
জীবনযৌবনধন আনন্দনিদান। ধু ॥
শ্রাবণ মাসেতে ময়না বড় দুখ লাগো
ঝিমিঝিমি বরিখয়ে মনে ভাব জাগো।
ধরতী বহয়ে ধারা রাতি আন্ধিয়ারী
খেলয়ে বধুর সনে প্রেমের ধামারী।
শ্যামল অম্বর শ্যামল খেতি
শ্যামল দশদিশ দিবসক জুতি।
খেলয়ে বিজলী মেহু চামরের সঙ্গে
তমসী ভীমশ্রী নিশি রঙ্গ-বিরঙ্গে।
শ্রাবণে সুন্দর ঋতু লহরী ওথার
হরি বিনে কৈছনে পাইব পার।
খরতর সিন্ধুরব পবন দারুণ
চৌগুণ বাড়িয়া যায় বিরহ-আগুন।
আকুল কামিনীকুল কামভাবত্রাসে
পিয়া-পাও বন্দয়ে যে রতিরস-আশে।
জনমদুখিনী তুই রাজার দুহিতা
বিফল সে নাম ধর লোরের বনিতা।
সুজনপীরিত জান নিত্য নব মালা
লস্কর নায়কমনি জগ-উজিয়ালা॥

ময়নাবতী উত্তর দিলে ভৈরব রাগে,

না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল
আন পুরুষ নহে লোর-সমতুল।
লাখ পুরুষ নহে লোরক স্বরূপ
কোথায় গোময়কীট কোথায় মধুপ।...

ভাদ্রমাসের বিরহবর্ণনায় দূতী পঞ্চমুখ হল—কল্যাণ রাগে জয়দেবের ছাঁদে,

ভাদ্রমাসে চন্দ্রমুখী স্মরচিতা কামিনী
একাকী বসতি অতি ঘোরং

অধর মধুরৌ তাম্বুল বিনে ধূসরৌ
নিচল চকোর-আঁখি ঝোরং।

ময়নাবতী, তেজ নিজ মান পরিখেদং
দুরন্ত বিরহানলৌ দহতি তব অন্তরৌ
তথাপি ন চেতই ময়না-চেতং।

বনফুল-মঞ্জরী কিমিতি অতি সীদতি
মলিন আঞ্জন মুখ ভেশং
বিষাদিত বিলপসি সকল দিনযামিনী
অবিরত বিকল বিশেষং।

সিন্দূর বিনে শীশৌ মলিন কেশ ভেশৌ
কিমিতি মলিন তনুচীরং
শূন্য সুমন তনৌ শূন্য পাট সিংহাসনৌ
শূন্য সুবর্ণমন্দিরং।

শ্বেত ঋতু বরিষণ নিষ্ফল ধনি বঞ্চসি
ন শুনসি হিত সুখসারং
এ ভবসুখসম্পদৌ কিমিতি ধনি বঞ্চসি
তব তাত জগ-অধিকারং।

ভনতি কাজী দৌলত দূতী চাটুপাটু কৃত
সতীকর্ণে অট বিষ মানং
লস্কর গুণমণি দানে কল্পতরু
শ্রীযুত আশরফ-খানং॥

ময়নাবতীর উত্তর ধানশী রাগিণীতে,

চকা-চকী ত জিনি রজনী দম্পতী বিনি
একাকিনী জাগি প্রেম-ত্রাসে রে
লোর বিনে লোর ঘোর নয়নে বরিখে মোর
তনু দহে মদন-হুতাশে রে।
অবিরত লোর ইতি জপয়তি কলাবতী
আন মনে সমতুল নহে রে

শ্রীযুত আশরফ-খান শুনহ সতীর গুণ
কাজী দৌলতে রস গাহে রে॥

আশ্বিন মাসের গুণবর্ণনা করলে রত্না, তবুও ময়নার ধৈর্য টলল না। তখন প্রণয়কেলিজল্পনা ছেড়ে মালিনী ধরলে তত্ত্বকথা।

যেবা বল ময়নাবতী মৃত্তিকার কায়া
মাটি-লক্ষ্যে কেলি করে পঞ্চ-আপ্ত কায়া।…
পরমহংসের খেলা মাটির পাঞ্জর
মাটি-ভঙ্গে হংসরাজ গতি শূন্যান্তর।…
কে বুঝিবে মাটি-মর্ম পরম সংশয়
হাসি-খেলি যত ইতি মাটিতে মিশয়।…
মহামায়া-মাটি-মগ্ন হই যুবাজন
নারীর লাবণ্যরূপে মজিয়াছে মন।
তরুমূলে গ্রাসি যেন ভূমি রহিয়াছে
নারী-মায়াপাশে তেন পুরুষ রহিছে।

অগ্রহায়ণে রত্না পুরাণ-কথা পাড়লে।

ধর্মশাস্ত্র বহির্ভূত নহে কামকেলি
রাধা বিনু নিকুঞ্জে খেলয়ে বনমালী।
পুরুষবিদ্বেষী হেন বিদ্যা যে শুচিনী
সেহ চোর-প্রেমে মজি হৈল কামাধিনী।
এতেক তোমারে কহি হিতের বচন
পদার্থ না বুঝি কর আমাকে গঞ্জন।

ময়না বিরক্ত হয়ে বললে, শৈশবের ধাত্রী বলে ক্ষমা করলুম, কিন্তু

এসব শুনয়ে যবে জনক ভূপাল
ছত্রপতি তোর শিরে বৈঠাইব কাল।

পৌষমাসের বর্ণনায় মালিনীর সুর নরম হয়েছে।

দীর্ঘলী রজনী বৈরী হইল তোমারি
কোথায় সে কান্ত তোর কোথায় মাধুরি।
অবধি গোঞাইয়া গেল না আসিল লোর
না পূরিল কামকলা-রতিরস তোর।

মালিনী মিনতি করি নিবেদয়ে বাণী
ধীর জগৎভোগ লও অনুমানি।

ময়নাবতী উত্তর দিলে সিন্ধুড়া রাগে,

প্রাণের দুর্লভ কান্ত দেখিলে হৃদয় শান্ত
আঁখিযুগে পীয়ায় সানন্দ
মধুরমুরতি পতি আলোল-বিলোল গতি
অমৃতমণ্ডলি মুখচান্দ।
কর ত দেয়ন্ত লোরে যদি মোর শির পরে
না দোলয়ে দেহ যে আমার
সতী নামে ময়নাবতী জগতে রাখিমু খ্যাতি
মরণে ত মুক্ত স্বর্গদ্বার।

মাঘমাসের প্রস্তাব শুনে ময়নাবতী মালিনীর মতলব হৃদয়ঙ্গম করলে। সে ভাবলে

নগরিয়া লোক নগরে থাকে
শতমুখে ধাই বাখানে তাকে।
কত কত মুই শুনিব বোল
ঘাটে বসি মুই হারাইলুঁ কূল।
কুলটা মালিনী কুপন্থে চলে
মোকে-হ কুপন্থে লই যায় ছলে।...
ধাই-জন হয় জননীতুল
সে কেন কহে এত কুবোল।
ধাই হেন মোর না লয় মন
পুণ্য ছাড়ি কহে পাপবচন।

ফাল্গুনমাসে মালিনী বৈষ্ণবোচিত বসন্ত-উৎসব দোলক্রীড়ার লোভ দেখালে।

সুরঙ্গ ফাগুর গুঁড়া পরিয়া সকল
হরিগুণ গাহে সবে নগরে মঙ্গল।...
সুবিচিত্র পাটাম্বর কোঞ্চা পরিধান
অঙ্গে অঙ্গে রঙ্গশোভা কেয়ূর কঙ্কণ।
বান্ধিয়া পাটলি-চূড়া কুঙ্কুমে জড়িয়া
বাহেন্ত তবল তাল যুবক মিলিয়া।

মৃদঙ্গ কর্তাল বাজে কহন না যায়
ত্রিভঙ্গ মোহন বেশে মৃদঙ্গ বাজায়।
হেলি ঢলি বাহে তাল ভ্রময়ে মধুর
হরিগুণে পদগানে হরিষে অন্তর।
খেলয়ে নাচয়ে ফাগু-রঙ্গ দশ-বিশে
মৃত্তিকাপ্রতিমা কেহ দোলায় হরিষে।

ময়না অটল। চৈত্র-বৈশাখের মাধুর্যেও সে ধৈর্যহারা হল না। কিন্তু জ্যৈষ্ঠমাসে রত্নার কথা-শেষটুকু বলবার অবসর কবি আর পেলেন না। এইটুকুই দৌলৎ কাজীর শেষলেখা,

জ্যৈষ্ঠ মাস পরবেশ বৎসর হইল শেষ
দুঃখদশা না গেল তোমারি
দিনে দিনে পীড়া বাড়ে বিরহের শোকান্তরে
চন্দ্রকলা যেন যায় জরি
বহয়ে পবন মন্দ বাজায় মদনে দ্বন্দ্ব
হৃদে জাগে বিরল-অনল
পতি-রতিক্রিয়া গেল সে কান্ত আর না দেখিল
শরীর দগধে শ্রমজল॥

সুদীর্ঘকাল পরে কাব্যের বাকি কাহিনীটুকু পূরণ করেছিলেন আলাওল। এ অংশের রচনা অনুজ্জ্বল বর্ণনাময়। আলাওল একটি দীর্ঘ অবান্তর কাহিনীও জুড়ে দিয়েছেন, ময়নাবতীর ধৈর্য-উপদেশক সখীর মুখে রতনকলিকা-মদনমঞ্জরীর উপাখ্যান। আলাওলের উপসংহার সংক্ষেপে বলি।

দূতীকে লাঞ্ছনা করে তাড়িয়ে দিয়ে সখী চন্দ্রমুখীর উপদেশে ময়না ধৈর্য ধরে রইল। চৌদ্দ বৎসর অপেক্ষার পর সে স্বামীর কাছে দূত করে পাঠালে এক গুণী ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে, যিনি

কাব্যে কালিদাস সম হয় দ্বিজবর
শাস্ত্রে বররুচি কিংবা উমাপতিধর।

ইতিমধ্যে চন্দ্রানীর ছেলে হয়েছে, তার নাম প্রচণ্ডতপন। লোরের সভায় গিয়ে ব্রাহ্মণ হাজির হল এবং রাজার কাছে শিক্ষিত শারিকা পাঠিয়ে দিলে ময়নাবতীর দুঃখকাহিনী নিবেদন করতে। শারী বললে,

পুণ্য মহী তোমাদের দিব্য পিতৃভূমি
বিচারি ভুবন তেন না দেখিল আমি।
হেন স্থল সব তেজি শ্বশুরের দেশে
ময়না হেন গুণবতী তেজি বিনি দোষে।...
কোন দোষ তোমার বলিতে নারি আমি
বিস্মরি রহিছ আত্মনারী জন্মভূমি।...

লোরের চেতনা হল। মাণিক্যপুরের রাজা শূদ্রসেনের কন্যা চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়ে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে স্বদেশে ফিরে এল এবং দুই রানীকে নিয়ে সুখে ঘর করতে লাগল। লোরের মৃত্যু হলে ময়নাবতী-চন্দ্রানী সহমৃতা হল।

এই কাহিনীর ইতিহাস অনুসরণ করলে আমরা পৌছই চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য বর্ণনরত্নাকরে "লোরিক নাচো"-র উল্লেখ করেছেন। তাঁর সময়ে পূর্ব-ভারতের স্থানবিশেষে লোর-চন্দ্রানীর নাটগীত নিশ্চয়ই বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। আধুনিককালে দক্ষিণ-বিহারে আহীরদের মধ্যে লোরিক-মল্লের গান মহাকাব্যোচিত বিস্তার লাভ করেছে। বিহারী লোরিক-মল্লের গীতের পরিচয় শিক্ষিত-সমাজে প্রথম প্রচার করেন গ্রীয়রসন। এঁকে এই কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। বিহারী কাহিনীর মর্ম দেওয়া গেল। এর থেকে দৌলৎ কাজীর কাব্যকাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক সহজেই বোঝা যাবে।

লোরিক-মল্লের জন্ম গৌড়ে। তার বাপ বুড় বাঁইয়া (বুড়ো বামন), মা বুড় খুলেন (বুড়ি খুল্লনা), পত্নী মাজর (কাজীর ময়না)। গৌড়ের রাজা মাহারা (কাজীর মোহরা), তার কন্যা চানায়ন (চন্দ্রভানু, কাজীর চন্দ্রানী)। এর বিয়ে হয়েছিল সেওধারীর সঙ্গে। দেবী পার্বতীর শাপে এই বিবাহ দাম্পত্য মিলনে সার্থক হতে পারে নি, তাই রাজকন্যা বাপের বাড়িতেই থাকে। তারপর লোরিকের সঙ্গে চানায়নের দর্শন, প্রেম ও পলায়ন। চানায়নকে নিয়ে লোরিক গেল হরদি-রাজার রাজ্যে। সেখানে রাজসভায় সে পালোয়ানের কাজ নিলে। তার বাহুবল দেখে রাজা ভয় পেলে। লোরিককে জব্দ করবার জন্যে রাজা তাকে পাঠালে ভাগিনেয় হারোয়া-রাজার কাছে। লোরিকের সঙ্গে সংঘর্ষে হারোয়া-রাজা প্রাণ হারালে। ভাগিনেয়ের কাটামুণ্ড এনে লোরিক মামাকে দিলে। হরদি-রাজা তখনি লোরিককে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে পালাল। সেখানে কিছুকাল থেকে লোরিক

চানায়নকে সঙ্গে করে গেল দোসাদ (অর্থাৎ দৌঃসাধিক) রাজার রাজ্য ঠকপুরে। সেখানকার সকলই ঠক। সেখানে পাশা খেলে লোরিক হল সর্বস্বান্ত, যুধিষ্ঠিরের মতো। দোষাদ রাজা দ্যুতলব্ধ চানায়নকে অন্তঃপুরজাত করবার জন্যে পালকি পাঠালে চানায়ন বললে, এখনও খেলা শেষ হয় নি, আমার সোনার কৌটো তিনটি আর পায়ের আংটি এখনও রয়েছে, তাই নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে খেলব, এবং হারলে তোমার ঘরে যাব। চানায়নের সঙ্গে খেলায় রাজা হারতে লাগল। অবশেষে লোরিক রাজার সৈন্যসামন্তকে পরাজিত করে সিংহাসন অধিকার করলে। ঠকপুর জয় করে লোরিক গেল কৈলরপুরে। সেখানকার রাজা করিঙ্গা (কলিঙ্গ) বড় বীর। রাজার বাগানের একপাশে লোরিক-চানায়ন বাসা নিয়েছে। চানায়নকে দেখে রাজা প্রেমে পড়ল। লোরিক এগিয়ে এল, যুদ্ধং দেহি বলে। তার হল হার এবং তাকে চড়ানো হল শূলে। চানায়ন কাতর হয়ে ইষ্টদেবী দুর্গাকে ডাকতে লাগল। দেবী সদয় হয়ে লোরিক-মল্লকে উদ্ধার করলেন। তারপর আবার যুদ্ধ বাধল। সাতদিন সাতরাত যুদ্ধের পর করিঙ্গা রাজা প্রাণ হারালে। লোরিক সিংহাসন অধিকার করলে। বছরখানেক কাটলে চানায়ন স্বামীকে বললে, আমাকে তীরহুত দেশ দেখাও। লোরিক চলল তীরহুতে। সেখানে হিউনির নবাব তাকে পরাস্ত করে বন্দী করলে। চানায়ন খবর পাঠালে দেবর মহাবীর সওয়াকে। সে এসে নবাবকে হারিয়ে দিয়ে দাদাকে উদ্ধার করলে। কিছুকাল পরে লোরিকের মন গেল অতিরছা মুলুক অধিকার করতে। তার এই অভিলাষ জেনে দুর্গাদেবী বললেন, ওদেশ আমি আমার বোনকে দিয়াছি, ওখানে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করে পত্নী চানায়ন ও পুত্র চন্দ্রাজিকে সঙ্গে নিয়ে "ঘোড় কাটর"-এ চেপে চলল অতিরছা মুলুকে। সেখানে ঘোড়া মরল, আর লোরিক হয়ে গেল ফড়িঙ। গৌড়ে থেকে তার প্রথম পত্নী মাজরকে দুর্গা স্বপ্নে স্বামীর এই দুর্গতি জানিয়ে দিলেন। মাজর ছিল পূর্বজন্মে ইন্দ্রসেনের পত্নী। স্বর্গভ্রষ্ট হওয়ার সময় সে দেবতার কাছে দান পেয়েছিল এক সবুজ ঘোড়া আর মৃতসঞ্জীবন জল। এই "হরিয়র" ঘোড়ায় চেপে মাজর পৌছল অতিরছা মুলুকে আড়াই ঘড়ির মধ্যে। মৃতসঞ্জীবন জল ছিটোতে লোরিক পুনর্মানব হল। তারপর যথারীতি মিলন।

৪
আলাওল

দৌলৎ কাজীর পথ অনুসরণ করলেন রোসাঙ্গ-রাজসভার দ্বিতীয় বড় কবি আলাওল। ইনি দৌলৎ কাজীর অসমাপ্ত কাব্য পরিপূরণ করলেন এবং মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্মাবতী কাব্যের অনুসরণ করলেন। তারপরে ইনি প্রবর্তন করলেন বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ ইসলামি পদ্ধতি, ফারসী কাব্যের ও আরবী ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করে। পুরানো বাংলা সাহিত্যের আর কোন কবিই আলাওলের মত এত বইয়ের অনুবাদ করেন নি। বাংলায় মুসলমান কবিদের মধ্যে আলাওল সব চেয়ে প্রসিদ্ধ। তবে তাঁর কবিকৃতি রচনালালিত্যে ও ভাবসমৃদ্ধিতে খুব উৎকৃষ্ট হলেও কাব্যকলার নিকষে দৌলৎ কাজীর রচনার কাছে পরাজিত। আলাওলের রচনায় অনাবশ্যক ইসলামি ভাব নেই, দৌলৎ কাজীর রচনায় আবশ্যক-অনাবশ্যক কোন রকমই ইসলামি ভাবের স্পর্শ নেই। দৌলৎ কাজী ছিলেন আসলে গীতিকবি, আলাওল প্রধানত কাব্যকথক। সুফী সাধক ছিলেন দুইজনেই। আলাওলের লেখায় কবির অধ্যাত্মপ্রবণতার পরিচয় আছে বেশি, পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও কিছু কম নেই।

আলাওলের জীবন বৈচিত্র্যময়। তিনি ছিলেন ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের অমাত্যপুত্র। পিতাপুত্রে কোন কাজে এক সময় জলপথে চলেছিলেন। তাঁদের নৌকায় পড়ল ফিরিঙ্গি ডাকাত। ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধে বাপ গেলেন মারা। পুত্রকে হার্মাদরা বন্দী করে রোসাঙ্গে নিয়ে এসে রাজার ফৌজে বিক্রি করলে। কবি অশ্বারোহী সৈন্যদলে নিযুক্ত হলেন। অল্পকালের মধ্যে বিদেশী তরুণ আসোয়ারের বিদ্যাবুদ্ধি-কলাজ্ঞানের খ্যাতি সেনাশিবিরের বাইরে ছড়িয়ে পড়ল। আমীর-ফকীর সকলেই তাঁকে খাতির করতে লাগল "তালিব-আলিম" বলে। ফৌজ থেকে নাম কাটিয়ে কবি স্থান পেলেন রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মার মহাপাত্র সোলেমানের পরিষদে। সোলেমানের খাস দরবারে সর্বদা বিদ্যার আলোচনা ও কাব্য-সঙ্গীতের চর্চা চলত। একদিন প্রসঙ্গক্রমে লোর-চন্দ্রানীর

কথা উঠলে সোলেমান আলাওলকে অনুরোধ করলেন,

> এই খণ্ড-পুস্তক পূরাও মোর নামে
> দুগ্ধ মধু আনিয়া মিলাও একঠামে।

মহতের অনুরোধ কবি উপেক্ষা করতে পারলেন না।

রচনার উপসংহারে আলাওল দৌলৎ কাজীর রচনায় নিজের রচনা জুড়ে দেবার স্পর্ধার জন্যে বিনয় প্রকাশ করেছেন।

> শ্রীযুত দৌলৎ কাজী মহাগুণবন্ত
> তানে আগে করিয়া রচিলা আদি অন্ত।
> তান সম আমার না হয় গুণ-গাঁথা
> গুণিগণ বিচারিয়া কহ সত্য কথা।
> মোর মত বাক্য সাঙ্গ করিলুঁ পাঞ্চালি
> ভগ্ন বস্ত্র কাজে লাগে যদি দেয় তালি।

সোলেমানের অনুরোধে আলাওল ফারসী ধর্মনিবন্ধ তোহ্‌ফার অনুবাদ করেছিলেন ১০৭৩ হিজরীতে (১৬৬০ খ্রী)।

জায়সীর পদ্মাবতীর অনুবাদ করেছিলেন আলাওল শ্রীচন্দ্র সুধর্মার ও রাজ্যার্ধভাগিনী ভগিনীর পালিত-পুত্র রাজকুমার মাগন-ঠাকুরের অনুরোধে। জায়সীর কাব্যের ভাষা রোসাঙ্গের লোকের অবোধ্য, পয়ারে অনুবাদ করলে সকলেই বুঝবে। তাই যেমন আশরফের আজ্ঞায় দৌলৎ কাজী লোর-চন্দ্রানী লিখেছিলেন তেমনি মাগনের আদেশে আলাওল পদ্মাবতী রচনা করলেন। আলাওলের হাতে মূল অবধী কাব্য অল্পস্বল্প রূপান্তরিত হয়েছে, তাতে কাহিনীর ও কাব্যের বিশেষ হানি হয় নি। পাত্রপাত্রীকে আলাওল যথাসম্ভব বাঙালী ছাঁচে ঢেলেছেন। দুএকটি অবান্তর কাহিনীও জুড়ে দিয়েছেন। আলাওলের পদ্মাবতী পাঁচালী কাব্যের সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায় নি। ছাপা বইয়ের শেষাংশ আধুনিক রচনা। কে জানে কবি কাব্যরচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন কি না। কাহিনী সংক্ষেপে বলি।

চিতোরের রাজা নাগসেন, পত্নী নাগমতী। শুকের মুখে রাজা একদা শুনলে সিংহল-রাজদুহিতা পদ্মাবতীর রূপের কথা। শুনে তার মন হল চঞ্চল। যোগীর বেশ ধরে শুককে নিয়ে চলল সিংহলে। সেখানে পৌঁছে শুকের বুদ্ধিকৌশলে নাগসেন লাভ করলে পদ্মাবতীকে। স্বামী-স্ত্রী দেশে ফিরে এলেন; ফেরবার পথে বিপত্তি ঘটল সমুদ্রে যানভঙ্গ হয়ে। দেশে ফিরে দুই পত্নী নিয়ে রাজা সুখে

আছে। রাঘবচেতন নামে এক তান্ত্রিক পণ্ডিত ঘটনাচক্রে রাজার কাছে লাঞ্ছনা পেয়ে দেশ থেকে নির্বাসিত হল। পদ্মাবতী তাকে গোপনে ডাকিয়ে হাতের একগাছি কাঁকণ পুরস্কার দিয়ে রাজার হয়ে ক্ষমা চাইলে। রাঘবচেতন দিল্লীতে আলাউদ্দীনের সভায় গিয়ে তার কাছে পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা করলে। আলাউদ্দীনের লোভ হল। সে চিতোরে বলে পাঠালে পদ্মাবতীকে চেয়ে। নাগসেন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলে। আলাউদ্দীন সসৈন্যে চিতোরে এসে যুদ্ধে হারিয়ে রাজাকে বন্দী করে নিয়ে গেল। গৌরা ও বাদিলা দিল্লীতে গিয়ে কৌশলে রাজাকে মুক্ত করে আনলে। ইতিমধ্যে কুম্ভলনের রাজা দেওপাল পদ্মাবতীকে পাবার চেষ্টা করেছিল। ফিরে এসে একথা শুনে রত্নসেন দেওপালকে যুদ্ধে আহ্বান করলে। যুদ্ধে দেওপাল মারা গেল, রত্নসেনও দারুণ আঘাত পেলে এবং সাত দিন পরে দেহত্যাগ করলে। নাগমতী-পদ্মাবতী সহমরণে গেল। দলবল নিয়ে চিতোর আক্রমণ করতে এসে সুলতান আলাউদ্দীন দেখলে যে চিতা তখনও ধোঁয়াচ্ছে। চিতাকে প্রণাম করে সুলতান দিল্লীতে ফিরে গেল।

মাগনের অনুরোধে আলাওল ফারসী আখ্যায়িকাকাব্য 'সয়ফুল্-মুলুক বদিউজ্জামাল'-এর অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অর্ধেকের উপর লেখা হবার পর রচনাকার্য পরিত্যক্ত হল মাগন-ঠাকুরের মৃত্যুতে। তারপর আলাওল পেলেন শ্রীচন্দ্র সুধর্মার প্রধান সেনাপতি মুহম্মদ মুসার আশ্রয়। এঁর অনুরোধে নিজামীর ফারসী কাহিনীকাব্য 'হপ্ত পয়কর' অনুবাদ করলেন। তখন শাহ্-শুজা আরাকান-দরবারে আশ্রয়ার্থী। গুণী আলাওলের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হলেন শুজা। প্রবাসী দুজনের মধ্যে কিছু ঘনিষ্ঠতা হল। তার ফলে শুজার হত্যার পর রাজরোষে কবির হল কারাবাস এবং সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত। দীর্ঘকাল পরে আলাওল যখন মুক্তি পেলেন তখন তাঁর শরীর-মন ভেঙ্গে গেছে। এই দুঃসময়ে তাঁকে আশ্রয় দিলেন শ্রীচন্দ্র সুধর্মার প্রধান অমাত্য সৈয়দ মুসা। মুসার অনুরোধে কবি বহুকাল পরে সয়ফুল-মুলুক সমাপ্ত করলেন।

সৈয়দ মুসার আশ্রয় থেকে আলাওল গেলেন মজলিস নবরাজের সভায়। নবরাজ কবিকে অনুরোধ করলেন নিজামীর সেকান্দরনামার অনুবাদ করে তাঁর নাম চিরস্থায়ী করতে। কবি বলিলেন, আমি দায়গ্রস্ত বৃদ্ধ, কবিত্বের উৎস আমার শুখিয়ে গেছে। নবরাজ তখন কবির সব দায় স্বীকার করলেন। আলাওলও 'দারা-সেকান্দর-নামা' লিখলেন। ভনিতায় কবির নামের সঙ্গে নবরাজের নাম পড়ল গাঁথা।

আলাওলের রচনা সরল অথচ প্রগাঢ়। পদ্মাবতী তাঁর শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িকা। আলাওলের কাব্যমালায় মাঝে মাঝে গান বা পদাবলী আছে। এগুলির কোন-কোনটিতে তাঁর রচনাশক্তির বিশিষ্ট পরিচয় পাই। যেমন

কহু রাগিণী

আহা মোর বিদরে পরাণ
জাগিতে স্বপনে দেখি ভূমে নাহি আন। ধ্রু।
কি জানি লিখিছে বিধি এ পাপ-করমে
পাইয়া পরশমণি হারাইলুঁ ভ্রমে।
সে সব মনের দুঃখ কাহাকে কহিব
ব্যথিত বান্ধবকুল স্মরিতে মরিব।
যুগের অধিক যায় দুঃখে নিশি দিন
কেমনে সহিব প্রাণে জলহীন মীন।
কি লাগি দারুণ জীউ আছে মোর ঘটে
কঠিন পাষাণ হিয়া এ দুখে না ফাটে
মহন্ত সৈয়দ মুসা জ্ঞানেত কুশল
বিরহবেদনা গাহে হীন আলাওল॥

৫

মৃগাবতীর অনুসরণ

কুতবনের মৃগাবতীর অনুসরণ করেছিলেন অন্তত তিনজন কবি, দুজন হিন্দু একজন মুসলমান। হিন্দু কবিদ্বয় প্রাচীন, সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের। মুসলমান কবি আধুনিক কালের, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের। "দ্বিজ" পশুপতির কাব্য মুসলমান পাঠকসমাজে সুপরিচিত ছিল। পশুপতির পুথি অবলম্বনেই কাব্যটি ছাপা হয়েছে 'চন্দ্রাবলী' নামে। কবির কোন পরিচয় নেই ভনিতায়, কেবল দুএক স্থানে উপাস্যদেবীর নাম আছে—"কহে দ্বিজ পশুপতি কালিকার চরণে গতি নাচাড়ি রচিল মধুর বাণী"। কাহিনী যে প্রাচীন তা বোঝা যায়. মাঝে মাঝে সংস্কৃতভাঙা শ্লোকের ও প্রহেলিকার অস্তিত্ব থেকে। কাহিনী এই।

পশ্চিমে কনকানগর রাজ্য। রাজা অশ্বকেতু, রাণী সুলক্ষণী, পুত্র বিশ্বকেতু, মন্ত্রী সহদেব। বিদ্যাশিক্ষা সমাধা হলে পরে রাজপুত্র শিখতে চাইল "বিয়াল্লিশ সুরের গীত"। গুরু বললেন, সে আমি জানি না, তবে

বিজয়ানগর নামে দক্ষিণ-বেহার
শ্রীবৎসর নামে রাজা তাহার অধিকার।
বিয়াল্লিশ রাগে গীত সেই রাজা গায়
শিখহ মধুর গীত ভজিয়া তার পায়।

রত্নপুরে চন্দ্রসেন রাজা। তাঁর পাঁচ কন্যা ইন্দ্রসভায় নাচনী। ছোট চন্দ্রাবলী। ইন্দ্র পড়লেন তার প্রেমে। চন্দ্রাবলী ইন্দ্রের প্রেম প্রত্যাখ্যান করলে। ইন্দ্র শাপ দিলেন বার বছর মর্ত্যবাস হরিণীরূপে, মুক্তি হবে বনমধ্যে কামসরোবরে ডুব দিলে। বারো বছর শেষ হয়ে এল।

বিশ্বকেতু বেরিয়েছে মৃগয়ায়। নজরে পড়ল চন্দ্রাবলী হরিণী। তাড়া খেয়ে হরিণী ছুটল বনের মধ্যে। পৌঁছল কামসরোবরে। ডুব দিতেই তার স্বরূপপ্রাপ্তি। রাজকুমারকে পরিচয় দিয়েই চন্দ্রাবলী অন্তর্হিত হল। অপ্সরা-রূপমুগ্ধ রাজপুত্র আর সরোবরতীর ছাড়ে না। কি করেন রাজা সেইখানেই প্রাসাদ তৈরী করে দিলেন

ছেলের জন্যে। পরিচর্যা করতে লাগল ধাত্রী সুমতি। তার পরামর্শে রাজপুত্র ধৈর্য ধরে রইল। নির্দিষ্ট দিনে পাঁচ বোন অপ্সরা কামসরোবরে নাইতে এল। বিশ্বকেতু তাদের কাপড় আটক করলে। তারা আর জল থেকে উঠতে পারে না। তখন চন্দ্রাবলী বুদ্ধি করে পদ্মপাতায় শ্লোক লিখে তীরে ছুঁড়ে দিলে। সেটা কুড়িয়ে নেবার জন্যে বিশ্বকেতু ও তার লোকজন হুটোপাটি লাগাল। সেই অবসরে অপ্সরারা পালিয়ে গেল। বিশ্বকেতুর প্রণয়পীড়া গেল বেড়ে। সুমতি উপদেশ দিলে এবার এলে চন্দ্রাবলীর কাপড় লুকিয়ে ফেলতে। তাই করা হল। চন্দ্রাবলী বিশ্বকেতুর হাতে পড়ল। রাজধানীতে পুত্রবধূকে নিয়ে গিয়ে বিবাহ-উৎসব করতে চাইলেন রাজা। চন্দ্রাবলী জেদ ধরলে বোনেরা না এলে বিয়ে হবে না। সুমতির কাছে চন্দ্রাবলীকে রেখে রাজপুত্র পিতার সঙ্গে গেল দেশে বিবাহের ব্যবস্থা করতে। সুযোগ পেয়ে চন্দ্রাবলী লুকানো কাপড় নিয়ে পালাল। যাবার আগে সুমতির কাছে নিজের আংটি দিয়ে সে বলে গেল বিশ্বকেতু যেন সর্বদা সেই আংটি পরে থাকে এবং তার সন্ধানে রত্নপুরে যায়। ফিরে এসে বিশ্বকেতু কালিকাদেবীর পূজা করে যোগীর বেশ ধরে বেরিয়ে পড়ল।

অষ্ট দিকে খণ্ডাইল আপনার দেশ
ত্রিপুরানগরে আসি হইল প্রবেশ।

সে দেশ ছেড়ে রাজপুত্র অগ্রসর হল। কত দূর গিয়ে তার কানে এল বিয়াল্লিশ রাগের গান। সুরের দিক অনুসরণে সে পৌঁছল এক গাছতলায়। সেখানে এক ব্যক্তি জলছত্র খুলে বসে আছে। সে আত্মপরিচয় দিলে

শোন বাপু দ্বিজবর   শ্রীবৎসর নাম মোর
বেহার-নগরে মোর পুরী
পাত্রমিত্র প্রজা সঙ্গে   রাজ্য করি মহারঙ্গে
বসুদত্ত হৈল প্রাণের বৈরী
মোর রামা বিদ্যাধরী   চতুর্ধ্বজা নাম নারী
দিবসেত ধরে চারি কায়া
মহামন্ত্র-সেবক হৈয়া   সেবিয়াছে মহামায়া
বর দিল সেই মহামায়া।
প্রথমে অবোলা বস   দুয়জে বৎসর দশ
তৃতীয়তে দেহ পরিপূর্ণ

সন্ধ্যাতে নারী যুবতি কৌতুকে গোঙাই রাতি
পদ্মা জিনিয়া রূপবর্ণ।
চন্দ্রের রোহিণী জিনি ইন্দ্রদেবের শচীরানী
যার রূপ দেবগণ চান
তাহা জিনি চতুর্মূর্তি সুন্দর অপূর্ববতী
বসুদত্তে শুনিয়া ব্যাখ্যান।
একদিন নিদ্রাভরে শুইয়াছি মন্দির ঘরে
চতুর্মূর্তি লৈয়া নিশি শেষ
মায়া করি বসুদত্তে নিদ্রা ঝাঁপাইয়া রাত্রে
বাসরে আসি হইল প্রবেশ।
প্রবেশমাত্র হৈল ঘরে জাগরণ তৎপরে
প্রদীপ-উজালে ব্যক্ত হৈল
দেখিয়াত বসুদত্ত রানী হৈল মূর্তিমত
কায়ে মনে দেবীকে স্মরিল।
স্মরিয়া দেবীর পায় রানী হৈল কাষ্ঠকায়
বসুদত্ত হৈল হতমতি
আমাকে পুন লইয়া রথে নিল তুলিয়া
বাহুবলে আইল রাতারাতি।
লোকে আনে নানা মায়া সভাকে নিদ্রালী দিয়া
ঘরে নিদ্রা যায় সর্বজন
আমাকে আনিল এথা কেহ নাহি পায় বার্তা
দেখ মোর এহি বিড়ম্বন।

শুনে বিশ্বকেতু চলল কর্পূরনগরে বসুদত্তকে জব্দ করতে। দেবীর অনুগ্রহে রাজপুত্র বসুদত্তকে বধ করলে। কৃতজ্ঞ শ্রীবৎসর তাকে বিয়াল্লিশ সুরের গান শিখিয়ে নিজের রাজধানীতে নিয়ে গেল। কিছুকাল সেখানে থেকে বিশ্বকেতু বিদায় মাগলে। রাজা তাকে আটকে রাখবার জন্যে রাত্রিতে তার ঘরে চতুর্ব্বজাকে পাঠিয়ে দিলে। বিশ্বকেতু তাকে নানারকমে পরখ করল। চতুর্ব্বজা বুদ্ধি করে সব এড়িয়ে গেল। শেষে দুজনের মধ্যে প্রহেলিকা-সংবাদ চলল। বিশ্বকেতু প্রশ্ন করলে

এক বয়ক্রম এক পাঠং
দুই স্নাতব্য এক মাঠং।
রঙ্গ বর্ণ এক কাম
গুণঘোষণা এক নাম॥

চতুর্ব্বজা সমাধান বলে চাপান দিলে

আশ্চর্য্য পর্ব্বত এক নামে অর্ত্তাধারী
তাহাতে শেখান এক মোহন মুরারি।
অপর বিষ্ণুমণ্ডপ মধ্যে বসতি সপ্ত দেবতা
একত্রে বসতি পরিভেদ নাস্তি কষ্ট কথা॥

খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে চতুর্ব্বজার চোখ একটু লাল দেখে বিশ্বকেতু বুঝতে পারলে যে সে কুমারী নয়, বিবাহিত নারী। তারপর সে বেরিয়ে পড়ল রত্নপুরের উদ্দেশ্যে। নানা দেশ এড়িয়ে পৌঁছল সমুদ্রের ধারে। সেখানে লোক পারাবার করে এক অভিশপ্ত কুমীর। তাকে উদ্ধার করলে রাজপুত্র। তারপর রাক্ষসের কবল থেকে তরুণীর উদ্ধার হল। তার ফলে রাজা শ্রীধর তার পরিত্যক্ত কন্যাকে ঘরে ফিরিয়ে আনলে ও তার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলে। তার পর বিশ্বকেতুর পথে পড়ল গভীর বন। সঙ্গী রাক্ষসকে বিদায় দিয়ে রাজপুত্র ভাবতে লাগল যাই কোথায়।

তথাই বসিয়া বীর আছিল মনধ্যানে
সংমায়ের দেশে যাইতে ভাবিলেক মনে।
আগমে বুঝিল তার কোথা ঘর-পুরী
যে রাজার দেশে থাকে সাউদের নারী।...
অবশেষে উত্তরিল নিত্যানন্দের পুরী
পুরীর বাহিরে ঘর উদাম-দুয়ারি।
থাপ-ঝাঁপ নাহি ঘরে কাগ উড়ি যায়
তার মধ্যে সাউদানি শুইয়া নিদ্রা যায়।
তৃণশয্যা করি বুড়ি আছেন শুইয়া
অগ্নি-জাগা ডোগাখানি পৃষ্ঠে আছে থুইয়া।
ইষ্টমিত্র নাহি দেশে নাহি দয়ামায়া
এহিমতে রহে বুড়ি চিত্ত নিবারিয়া।

রাত্রিতে রাজপুত্র তার কুটীরে উপস্থিত হল এবং তাকে মা বলে তার আতিথ্য স্বীকার করলে। সকালে তাকে এক ছড়া রত্নহার দিয়ে বিদায় নিলে। তার পরে পৌছল আর এক অরণ্যে! সেখানে দেখে স্বর্ণশয্যায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে এক তরুণী, নাম চিত্রমালা। তাকে অপহরণ করে এনেছে তার পোষ্যভ্রাতা রাক্ষস। রাক্ষসের সঙ্গে বিশ্বকেতুর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হল। দুজনেই সমান বীর, কেউ হারে না। তখন ঠিক হল সমস্যাপূরণের দ্বারা হারজিত নির্ণয় হবে।

রাক্ষসা বলে শুন বীর জিজ্ঞাসিব শাস্ত্রে
চারি শ্লোক জিজ্ঞাসিব চারি প্রহর রাত্রে।
বিচারিয়া শ্লোক মোরে পার বুঝাইতে
আমাকে জিনিয়া স্ত্রী লৈহ হরষিতে।

চিত্রমালা রইল মধ্যস্থ। বিশ্বকেতু সমস্যাপূরণে সমর্থ হল। রাক্ষস হার মানলে। রাজপুত্র তাকে অন্ধ করে বধ করলে। তারপর চিত্রমালার সঙ্গে বিশ্বকেতুর প্রহেলিকা-বিলাস হল। তার পর তাকে রাজপুত্র পৌঁছে দিলে তার পিতা রাজা উদয়চন্দ্রের কাছে। উদয়চন্দ্র চিত্রমালাকে সমর্পণ করলে বিশ্বকেতুর হাতে।

সেখান ছেড়ে বিশ্বকেতু গেল বিহড়ানগরে। সেখানের লোকেরা কদাচারী, ভেড়া পোষে মদ-মাস খায়।

সম্মুখে দেখিল বীর চরে মেষপাল
মেসাম্বর নাম রাজা তার রাখোয়াল।
বসিয়াছে মেসাম্বর রাজপথ লৈয়া
হৃষ্টপুষ্ট করে বীর মদ্য মাংস খাইয়া।

রাজপুত্র মেসাম্বরের অতিথি হয়ে তার ঘরে গেল। সেখানে দেখলে তার মত অনেক রাজপুত্র বন্দী হয়ে আছে। মেসাম্বরকে অন্ধ করে দিয়ে বিশ্বকেতু তার নাগাল এড়ালে ভেড়ার চাম গায়ে মুড়ে। শেষে ডম্বুরার ঘায়ে মেসাম্বরকে নিপাত করলে। তার পর পড়ল এক বুড়ি ও তার ভূত-অনুচরদের কবলে। সেখান থেকে পালিয়ে রাজপুত্র গেল ধর্মরাজ্য কাঞ্চননগরে। রাজার সভায় সে বিয়াল্লিশ রাগের গান শোনালে।

রাজা আদি সিদ্ধাগণ যতেক আছিল
শুনিয়া গীতের ধ্বনি জারজার হৈল।

যোগী-গুরু রুদ্রভরতের কাছে বিশ্বকেতু রত্নপুরের পথের দিশা পেলে। রুদ্রভরতের কাছে দীক্ষা নিয়ে রাজপুত্র শুরু করলে যোগী-চর্যা। ভরত কালীপূজা করলেন, বিশ্বকেতু উরুর মাংস কেটে আহুতি দিলে। শিষ্যকে গুরু দিলেন জ্ঞান-উপদেশ।

এই বলে মহাগুরু হৈয়া দয়াময়
কর্ণে মুখ দিয়া গুরু এক শব্দ কয়।
হেন শব্দ দিল গুরু কোটি মধ্যে গোটি
শব্দ পাইয়া কৈল বীর প্রণাম কোটি কোটি।
এই মত করে গুরু পঞ্চ মাস যায়
নিতি নিতি দিন বীর এক শব্দ পায়।
এক শব্দ কহে গুরু দেউল-প্রমাণ
ভাবিতে ভাবিতে হয় সরিষা সমান।
তার মধ্যে ধিয়ান করি দেখে অন্ধকার
তাহাতে পাইল চিহ্ন সয়াল সংসার।

রত্নপুরে যাবার আগে গুরু শিষ্যকে পরীক্ষা করলেন। গুরুর আদেশে শিষ্য জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে ভক্তিবিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রতিপন্ন করলে। তারপর

রাজবেশ ছাড়ি বীর যোগ-খেন্তা গলে
ডিঙ্গাতে চড়িয়া বীর ভাসিলেক জলে।

দু সমুদ্র পার হয়ে তিন সমুদ্রে গিয়ে ডিঙা উল্টে গেল ত্রিমঙ্গল (অর্থাৎ তিমিঙ্গিল) মাছের ঠেলায়। নৌকার পাটা ধরে বিশ্বকেতু তীরে উঠল। আশ্রয় পেলে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর কুটীরে। সেখান থেকে গিয়ে বিশ্বকেতু অজগরের খর্পরে পড়ল। রাজপুত্রের হাতের ছোঁয়া পেয়ে অজগরের মুক্তি হল। অজগর তাকে মণি দিলে। মণি নিয়ে বিশ্বকেতু গেল চন্দ্রাবলীর পুকুরে। রাজপুত্রের আকৃতিপ্রকৃতি দেখে দাসী গিয়ে চন্দ্রাবলীকে খবর দিলে। প্রেমের দৃঢ়তা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে চন্দ্রাবলী রাজকুমারকে নিগ্রহ করতে লাগল। পরিশেষে রাজকুমারকে বলা হল অনুচরীদের মধ্যে থেকে চন্দ্রাবলীকে বেছে নিতে। রাজপুত্র চন্দ্রাবলীকে না পেয়ে কাতর হল। তখন চন্দ্রাবলী ধরা দিলে। দুজনের বিয়ে হল। চন্দ্রাবলী ও চিত্রমালাকে নিয়ে রাজপুত্র স্বস্থানে ফিরে এল।

দ্বিতীয় হিন্দু কবির রচিত 'মৃগাবতীচরিত্র'[১] কামরূপী উপভাষায় লেখা (এ ভাষাকে পুরানো অসমীয়াও বলা যেতে পারে।) কবির নাম "দ্বিজ রাম"। কবির ভক্তিপ্রবণতার পরিচয় আদ্যন্ত বিদ্যমান। যেমন

আরম্ভ
জয় নমো নারায়ণ পুরুষপ্রধান
জয় হৃষীকেশ সদাশিব সর্বজান।
অনাদি অনন্ত জয় জয় কৃপাসিন্ধু
জয় দামোদর দীনদুখিতর বন্ধু।...

শেষ
খণ্ডিত বিষয় তাত সুখ নাহিকয়
অখণ্ড সুখক সাধা ভজি কৃপাময়।
কুৎসিত বিষয় আর ছাড়িয়ো সকাম
কহে দ্বিজ রামে ডাকি বোলা রাম রাম॥

মোহম্মদ খাতেরের মৃগাবতী-যামিনীভানের কাহিনীতে পরবর্তী কালের বাংলা-ইসলামি পদ্ধতির ছাপ পূর্ণমাত্রায় পড়েছে। গল্পটিও ছোট হয়েছে। কাহিনীটি কুতবনের মৃগাবতী থেকে নয়, পরবর্তী কালের কোন হিন্দী কাব্য থেকে নেওয়া। এ কাহিনীতে রাজা বানারসের জগৎচন্দ্র রায়। রানীর নাম ভবানী। পুত্র যামিনীভান জন্মালে দৈবজ্ঞ

কহে এই লাড়কা যবে হইবে সিয়ানা
দেখিয়া পরীর তরে হইবে দেওয়ানা।
সেই গমে ছাএর করিবে দেশে দেশে
দুঃখ পাবে সুখ তাতে হইবেক শেষে।

পরী মৃগাবতীর পিতা রূপরঙ্গ রায় ছিলেন কাঞ্চীপুরের রাজা।

করিমুল্লার 'যামিনীভান' ছোট রচনা নয়। সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা।

[১] সচিত্র পুথি, পত্রসংখ্যা ৩৬। হেমচন্দ্র গোস্বামী সঙ্কলিত অসমীয়া পুথির বিবরণ (১৯৩০) পৃ ১৫২-১৫৩ দ্রষ্টব্য।

৬

বিবিধ রোমান্টিক কাহিনী

মনোহর-মালতী উপাখ্যানের উল্লেখ আছে লোরচন্দ্রানী কাব্যের আলাওল রচিত অংশে। হিন্দীতে এই বিষয়ে রচনা পাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই সময়ে একাধিক বাঙালী কবিও এই বিষয়ে কলম ধরেছিলেন। মুসলমান কবিদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন বোধ করি মোহম্মদ কবীর। ইনি কোন হিন্দী কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণ করেছিলেন।

এহি সে সুন্দর কেচ্ছা হিন্দীতে আছিল
দেশভাষাএ মুক্তি পাঞ্চালী রচিল।

সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী' লেখা হয়েছিল ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে। উত্তর-বঙ্গের সাকের মামুদ 'মধুমালা-মনোহর' লিখেছিলেন ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে, বাইশ বছর বয়সে।

সমসের আলীর অসম্পূর্ণ 'রেজওয়ান সাহা' হেদমত আলী ছাপিয়েছিলেন আছলমকে দিয়ে সম্পূর্ণ করিয়ে

মহাকবি সমসের আলি স্বর্গে হৈল বাস
কাব্যেতে চতুর ছিল দ্বিতীয় সে ব্যাস।
খণ্ড-কাব্য পুস্তক পুরিতে মোর আশ
গাহে হীন আছলমে হইয়া উল্লাস।

আছলমের মাতুল ছিলেন চাটগাঁ জোয়ারগঞ্জ থানায় সাহেবপুর গ্রামনিবাসী ইছুফ আলী। তাঁরই পুত্র হেদমত আলী। মাতুলপুত্রের বিদ্যা-বুদ্ধি-রসজ্ঞতার প্রশংসা করেছেন আছলম

সর্বগুণে গুণী পুন রূপে পঞ্চবাণ
সঙ্গীত পুরাণ বেদ আগম নিদান।
অমর পিঙ্গল নট কাব্য রস রতি
কহিলাম আদি অন্তে মাঝে যত ইতি।

আছলমের কাছে সমসেরের কাব্যের পরিচয় পেয়ে ছেদমত তাঁকে লিখলেন "উন পুন করি পুথি দিবারে পাঠাই"। তাই কবি বলেছেন

কবি সমসের রসগুণ পদে ভক্তি
স্থানে স্থানে প্রচারিল নিজ মন-উক্তি।
আরতী ছেদমত আলী করিল পূরণ
শুদ্ধভাবে ছাপে তিনি করি প্রাণপণ।

রেজওয়ান-সাহা ছাপা হয়েছিল ১২৪৯ সালে (মঘী ?)।

চাটিগাঁয়ে পুরানো কবিদের মধ্যে 'লায়লি-মজনু'র কবি বহরামের বিশিষ্ট স্থান আছে। ইহার পিতা মোবারক খান চাটিগাঁয়ের "নৃপতি" নেজাম শাহা স্বরের "দৌলত উজীর" ছিলেন, এবং ইনিও পরে এই পদ পেয়েছিলেন। কবি ছিলেন সুলতান হোসেন-শাহার উজীর মহম্মদ-খানের বংশধর। ভনিতায় প্রায়ই কবিগুরু পীর আসাউদ্দীন শাহার নাম আছে। রচনারীতি সুন্দর। কাব্যের আরম্ভ

প্রণমহো আল্লা মহম্মদ-নাম সার
দোসর-বর্জিত প্রভু এক-করতার।
করিম করুণাসিন্ধু রহিম দয়াল
রজ্জাক আহারদাতা পালক সভার।...
নির্ণিতে না হয় রঙ্গ বর্ণিতে বরণ
কহিতে কথন নহে শুনিতে বচন।
পঠিতে পুস্তক নহে লিখিতে অক্ষর
বুঝিতে মরম তান অধিক দুষ্কর।

বহরামের এক পূর্বপুরুষ হামিদ-খান (মহম্মদ-খানের পুত্র ?) বলি-প্রহ্লাদের মত দানশীল সর্বংসহ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কবি বলেছেন

শুনিয়া দানের ধ্বনি ক্রোধ হইল নৃপমণি
যত ধন লুটায়ে সদায়
কেমন ধার্ম্মিক সার এক অব্দ বারে বার
তাহাকে বুঝিমু পরীক্ষিয়া
প্রথম কোপে বাঘের জালে ফেলিলা দেখিলা ভালে
ব্যাঘ্র দেখি নামাইল মাথা

দ্বিতীয়ে বান্ধিয়ে শিলা সাগরেতে পরীক্ষিলা
নামাজ পড়িল সুখে তথা।
তৃতীয়ে বান্ধিয়া রাগে দিলেন্ত হস্তীর আগে
গজে দেখি ছালাম করিল।
চতুর্থে জৌতের ঘরে রাখিলা হামিদ-খাঁরে
আনলে রহিয়া পরীক্ষিল।
পঞ্চমে খড়্গের ঘাতে পরীক্ষিলা নরনাথে
খড়্গ ভাঙ্গি হৈল খানখান
ষষ্ঠমে হানিয়া শর পরীক্ষিলা নৃপবর
অঙ্গে না লাগিল এক বাণ।
সপ্তমে গরল দিলা মহারাজ পরীক্ষিলা
করিলেন্ত প্রশংসা অধিক...

রোসাঙ্গ-চাটিগাঁয়ের কবিদের ভাষায় বিশুদ্ধিতা বজায় ছিল শেষ অবধি, অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীর গোড়া পর্য্যন্ত।[১] ভাষা যে "এছলামি" পুথির বাংলা নয় তার উল্লেখ থাকত ছাপা বইয়ের নামপত্রে, "সাধুভাষায় রচিত" বলে। পণ্ডিত কাইমদ্দিনের 'চমন-বাহার'-এর বিজ্ঞাপনে প্রকাশক বলেছিলেন, "পুস্তকখানি সাধুভাষা বাংলায় লেখা, কিন্তু পুথির ভাবে ও আকারে ছাপা।" চাটিগাঁ নালপুর গ্রাম-নিবাসী আজগর আলি পণ্ডিতের বৃহৎ রচনা 'চিন লেম্পতি' বিশুদ্ধ সাধুভাষায় লেখা, পুরানো পাঁচালী কাব্যের ছাঁদে। বইটি ছাপা হয়েছিল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু লেখা হয়েছিল ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের দিকে।

[১] বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১-১ পৃ ১৪-১৭।

৭

নবীবংশ ও জঙ্গনামা

বাঙালী হিন্দুর পুরাণ-পাঁচালীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ইসলামি-পদ্ধতির লেখকেরা বেশি দিন এড়িয়ে চলতে পারলেন না। তাঁরা ইসলামধর্ম-প্রচারকদের জীবন-চরিত্র ও কাফের দলন কাহিনী ঢালাই করলেন হরিবংশ-পাণ্ডববিজয়ের ছাঁচে। এই রচনাগুলি দু-শ্রেণীর। এক শ্রেণীতে পড়ে পয়গম্বরদের কাহিনী। এগুলির নাম সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীতে—'নবীবংশ', 'রসুল-বিজয়', 'রসুলনামা' বা 'মোহাম্মদ-বিজয়', উনবিংশ শতাব্দীতে—'কাছাছোল আম্বিয়া' (কাসাহুল্-আম্বিয়া, অর্থাৎ নবীদের কেচ্ছা)। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হচ্ছে হজরত নবীর পরবর্তী খলিফাদের বিজয়-অভিযান ও গৃহবিবাদের বর্ণাঢ্য কাহিনী। এগুলির সাধারণ নাম 'জঙ্গনামা' (অর্থাৎ যুদ্ধকথা)।

এই ইসলামি পুরাণ-পাঁচালীর ধারা নিঃসৃত হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে চাটিগাঁয় ও সিলেটে। চাটিগাঁয় মুসলমান উপনিবেশের ইতিহাস দীর্ঘকালের। বাংলায় মুসলমান অধিকারের পূর্ব থেকেই এখানে সমুদ্রগামী বণিক্-প্রচারক আরবরা ঘাঁটি করেছিল। এখানকার মুসলমানেরাও ষোড়শ শতাব্দীর অনেক আগে, বোধ করি ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে, বাঙালী বনে গিয়েছিল। সিলেটে মুসলমান উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল এই সময় থেকে। (ইব্‌নে বতুতা চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সপ্তগ্রাম থেকে এই "বঙ্গাল" দেশে এসেছিলেন হজরৎ জলালুদ্দীন তব্রীজির সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে।) সিলেটের মুসলমানেরা উত্তরপশ্চিমের হিন্দীভাষী মুসলমানদের সঙ্গে বরাবর যোগ রেখে চলেছিল বলে এরা পুরাপুরি বাঙালী হয়ে উঠতে পারেনি অনেক কাল অবধি। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এঁরা কায়থী অক্ষরের একটি প্রকারভেদ ব্যবহার করে এসেছিলেন। এই হরফ 'সিলেটী নাগরী' নামে প্রসিদ্ধ। তার পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে এখানে এবং উত্তরবঙ্গে গড়ে উঠেছিল একটি ইসলামি লেখক-গোষ্ঠী। শেষে পশ্চিমরাঢ়ে ভুরশুট অঞ্চলে ইসলামি সাহিত্যের বিশিষ্ট কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। উত্তরবঙ্গে সিলেটে এবং পশ্চিমরাঢ়ে উত্তরপশ্চিম-ভারতীয় হিন্দী ইসলামি প্রভাব প্রকটতর হয়েছিল। এই তিন কেন্দ্রেই ইসলামি পুরাণকাহিনী

লেখা হয়েছিল শুধু বাংলা-জানা জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্যে। সেই কারণে ভাষাতেও আরবী-ফারসী শব্দের ভিড় জমেছিল। এর চরম পরিণতি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ছাপা বইয়ের "এছলামি বাঙ্গালা"-য়।

ইসলাম ধর্মের পুরাণ-পাঁচালী পেয়েও মুসলমান জনসাধারণ বাংলাসাহিত্যের সাধারণ ধারাকে বর্জন করেনি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে যেমন অষ্টাদশ শতকেও তেমনি রামায়ণ-মহাভারত কাহিনী অত্যন্ত রুচিকর ছিল হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ম সংগ্রহে কলিকাতা-কলিঙ্গা নিবাসী শেখ জালাল মামুদের লেখা কাশীরামদাসের ভারত-পাঁচালীর পুথি আছে। নিজের ব্যবহারের জন্যেই পুথিটি লেখা হয়েছিল, ১১৭৩ খ্রীস্টাব্দে। পুষ্পিকায় লিপিকার লিখেছেন, "সঅক্ষর শ্রীসেখ জামাল মাহমুদ এ পুস্তক নিজের কারণ লিখিলাম ইতি।"

নবীবংশ-রসুলবিজয় পাঁচালী-কাব্য রচনা করেছিলেন চাটিগাঁয়ের সৈয়দ সুলতান, জৈনুদ্দীন ও শেখ চাঁদ এবং উত্তরবঙ্গের হেয়াৎ (বা হায়াৎ) মামুদ। সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ সমাপ্ত হয়েছিল ১০৬৩ হিজরীতে (১৬৫৩ খ্রী)। এই সুফী সাধক-কবি একটি যোগতত্ত্বনিবন্ধ লিখেছিলেন এবং কতকগুলি ভালো পদাবলী রচনা করেছিলেন। জৈনুদ্দীনের কাব্য লেখা হয়েছিল এক ইউসুফ-খানের অনুরোধে। হেয়াৎ মামুদের কাব্যের নাম 'আম্বিয়াবাণী', রচনাকাল ১১৬৫ সাল (১৭৫৮ খ্রী)। রচনাবাহুল্যে হেয়াৎ মামুদ উত্তর-বঙ্গের পুরানো কবিদের মধ্যে প্রধান। এঁর অপর রচনা 'জঙ্গনামা' বা 'মহরম-পর্ব' (১৭২৩ খ্রী), হিতোপদেশের ফারসী অনুবাদের বাংলা তর্জমা (১৭৩২ খ্রী) এবং ইসলাম-তত্ত্বনিবন্ধ 'হিতজ্ঞানবাণী' (১৭৫৩ খ্রী)।[১]

'জঙ্গনামা' যুদ্ধকাহিনী, বিশেষ করে ইস্‌লাম ধর্মপ্রচারক আদি ইমামদের ইরান-বিজয় এবং আত্মকলহ-কাহিনী। কয়েকখানি জঙ্গনামার বিষয় কারবালার করুণকাহিনী। হাসান-হোসেনের মৃত্যু অভিমন্যুবধের মতই শোচনীয়। বাঙালী মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে এই কাহিনীর সমধিক আদর ছিল। সবচেয়ে পুরানো বাংলা জঙ্গনামা বোধ করি কবি মোহম্মদ-খানের 'মুক্তাল-হোসেন' (১০৫৬ হিজরী, ১৬৪৬ খ্রী)। বংশপরম্পরায় কবি চাটিগাঁয়ের লোক। মুর্শিদ পীর শাহা-সুলতান কাব্যরচনার প্রেরণা দিয়েছিলেন। মুক্তাল-হোসেনের রচনা-রীতি প্রসাদগুণযুক্ত। যেমন পোষ্টার গুণবর্ণনা

[১] হেয়াৎ মামুদের গ্রন্থাবলী ডক্টর মযহরুল ইসলাম কর্তৃক সম্পাদিত এবং রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৬১)।

প্রণামি তাহান পদ রচিব পাঞ্চালী-পদ
তান পুত্র বলে হলধর
চাটিগ্রাম দেশ-কান্ত পৃথ্বী[১] জিনি ধৈর্যবন্ত
গাণ্ডীবে অর্জুন সমসর।
শান্ত দান্ত গুণবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
দুষ্টস্তে একান্ত কোপ গণি
ক্ষোভন্ত করন্ত বল নাশন্ত রিপুর দল
জলন্ত আনল হেন জানি।
প্রশংসন্ত সর্বদেশ কীর্তি গান্ত সবিশেষ
মহিষ মারন্ত এক শরে
শৌর্যবন্ত বীর্যবন্ত অনন্তকে কৈল অন্ত
একশরে শার্দ্দুল সংহারে।
সত্যবন্ত জিনি ধর্ম জ্ঞানবন্ত জীব সম
প্রজাক পালন্ত ধর্ম রাখি
মুখজোতি পূর্ণচন্দ্র হাস্য জিনি মকরন্দ
কোমল কমলদল আখি।
দশন মুকুতা-পাতি অধর রঙ্গিম অতি
ভুরুযুগ টালনি দোলনী
দীর্ঘবাহু মধ্য চারু গজশুণ্ড দুই উরু
চরণ তরুণ কমলিনী।
নারীমুখপদ্মভৃঙ্গ সমরে সদৃশ সিংহ
মধুবাণী সুধাসম হাস
তেজি গুরুজন-ভীত সকল কামিনী-চিত
শ্যামধন মিলিবার আশ।
কেহ বোলে কার ভয় দেখি আইল কামরায়
কেহ বোলে কোথায় অনঙ্গ
এহি মুখ পূর্ণ শশী কেহ বোলে নভোবাসী
কোথা চান্দ নাহিক কলঙ্ক।

কেহ বোলে দিনকর কেহ বোলে বিদ্যাধর
কেহ বোলে না হয় সফল
এহি সে জালাল-খান সুরপতি পঞ্চবাণ
রূপে জিনিয়াছে [মহীতল]।
সে পদপঙ্কজরেণু শিরে ধরি কান্ত জনু
রচিব পাঞ্চালী অনুপাম...[১]

বাংলায় পাঁচালী-কাব্যরূপে বই লেখবার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন কবি এই কথায়,

হিন্দুস্থানে লোক সবে না বুঝে কিতাব
না বুঝিয়া না শুনিয়া নিত্য করে পাপ।
তে-কাজে সংক্ষিপ্ত করি পাঞ্চালি রচিলুঁ
ভালমতে পাপপুণ্য কিছু না জানিলুঁ।
পাঞ্চালি পড়িলে সবে মনে ভয় পাই
অবশ্য কিতাব কথা শুনিবেক যাই।
কিতাব আল্লার আজ্ঞা শুনিবেন্ত যবে,
দানধর্ম পুণ্যকর্ম করিবেন্ত তবে।
অবশ্য মোহরে সবে দিব আশীর্বাদ
মহাজন আশীর্বাদে খণ্ডিব প্রমাদ।
বিশেষ পীরের আজ্ঞা না যায় খণ্ডন
রচিলুম পাঞ্চালিকা তাহার কারণ।[২]

সৈয়দ সুলতানের জঙ্গনামার প্রথম অংশে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে

অনিল বরুণ করি মৃত্তিকা সৃজিলা।
স্বর্গ নরক আদি জতেক নির্মিলা।
সুবলিত এক বৃক্ষ করিলা সৃজন
বিবিধ প্রকারে ভাসে সে তরু নির্মাণ।
আপনা অঙ্গেত তরু সৃজিয়া রাখিলা
বিবিধ প্রকারে শোভা সে তরু নির্মিলা।

---

[১] 'চাটিগ্রামে পাঠান ও মঘরাজত্ব', শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৫৫ পৃ ২৮-২৯।

[২] বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১-৫ পৃ ৯৮।

অতি জুতিমএ তরু সুগন্ধিবেষ্টিত
তরু হতে সুগন্ধি চৌদিকে আমোদিত।

শেষ

রসুলের পদযুগে করিয়া প্রণাম
রচিলেক সুলতানে পাঁচালি অনুপাম।
কহে সৈদ সুলতান সভানের তরে
সবে-মেহেরাজনামা রহিল [অতঃপরে]॥[১]

শেখ চাঁদ যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক তা জানা যায় সুলতান আহমদ ভুঁইয়া কর্তৃক আবিষ্কৃত 'কেয়ামত-নামা' (?) পুথির থেকে,

মুর্শিদের আজ্ঞা পাইয়া কহে হীন চান্দে
এগার শও বাইশ সন রচিল প্রবন্ধে॥[২]

১২২০ সালে নকল করা এক 'রসুল-নামা' বা 'মোহাম্মদ-বিজয়' পুথিতে কবির পিতার ও মুর্শিদের নাম মিলেছে[২]

ফতে মোহাম্মদ সুত সএক চান্দ নাম
মুর্শিদের আজ্ঞাএ পাঁচালি রচিলাম।
সাহাদৌলের শিশু হএ অধম চান্দা নাম
গুরুর আজ্ঞাএ পাঁচালি কহিল অনুপাম।

জঙ্গনামার আর এক কবি নসরুল্লা-খান অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। এঁর নিবাসও চাটিগাঁয়। কবির মুর্শিদ ছিলেন পীর হামিদুদ্দীন। পর্বত শিখরে আল্লা ও মুসার সংলাপ নিয়ে লেখা 'মুসার সওয়াল'-এর ('মুছার ছোয়াল') লেখক নসরুল্লা ইনিই কিনা বলা যায় না। এই নসরুল্লার রচনার কৈফিয়ৎ

তে-কাজে ফারসী ভাঙ্গি কৈলুম হিন্দুআনী
বুঝিবারে বাঙ্গালে সে কিতাবের বাণী।
আপনে বুঝন্ত যদি বাঙ্গালের গণ
ইচ্ছাসুখে কেহ পাপে না দেয়ন্ত মন।[৩]

---

[১] ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুথি। পত্রসংখ্যা ৫৮।
[২] 'মাহে নও' কার্তিক ১৩২৭ পৃ ৪০-৪৫ দ্রষ্টব্য।
[৩] বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১-১ পৃ ৮০।

তৃতীয় কবি মনসুরও এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। এঁর কাব্য 'আমীর জঙ্গনামা' বেশ বড় বই। কবি বোধ হয় সুফী-পন্থী ছিলেন। "শ্রীযুত মহাম্মদ শাহা"-র অনুরোধে কবি লেখনী চালিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের কবি গরীবুল্লা আমীর হামজার 'জঙ্গনামা' রচনা করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে। এঁর অসমাপ্ত রচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন সৈয়দ হামজা ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে। বড় জঙ্গনামা-কাব্যের মধ্যে সর্বশেষ রচনা বোধ হয় সাদ আলী ও আবদুল ওহাবের 'শহীদে কারবালা'।

এক হিন্দু কবির লেখা বড় 'জঙ্গনামা' কাব্য পাওয়া গেছে বীরভূম অঞ্চলে (?), 'ইমামএনের কেচ্ছা' বা 'ইমামের জঙ্গ'। কবির নাম রাধাচরণ গোপ (সংক্ষেপে রাধা গোপ)। পুথির লিপিকাল ১৮২৭। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর এদিকে যাবে না। আরম্ভ এইরকম

আগে বন্দ জলিল করতার
যাহার সৃজনি সংসার।
আল্লা আল্লা বল পাক পরবর দিগার
আখেরে দোজখে ডালি……যার।
দোজখ তরিতে বান্দা করহ ফিকির
জাহিরে বাতুনে লইনাম আল্লার জিকির।
আল্লার আরস-কোরসে কিছু মেহেরবানগি চাই
ইমামএনের কেচ্ছা কিছু মিলাইয়া গাই।
শ্রীযুত ছাহেবের কেচ্ছা রাধাচরণ গাএ
আল্লা আল্লা বল নবী পঞ্চতনের পাএ।
শেখ গোলাম লেখে পত্রী মন করিয়া থির
রোজ কায়ামতে করম কর ইমাম দস্তগির।

ভনিতায় মাঝে মাঝে সত্যপীরের দোহাই আছে।

বন্দিখানায় যত ছিল হইল খালাস
সত্যপীরের পাএ ভনে রাধাচরণ-দাস।
রাধা-দাসে লেখে মহরমের দশ দিন
নাপাক গোলামে দয়া করিবেম য়াবদিন।

হাসন-হোসেনের নিধনে ফতেমার শোক

বিবির আহাদে ধরতী তখন নড়ে
ওপরে আছমান যেন কুমারের চাক ঘোরে।
আরস-কোরস সব আগুন জলে যায়
তক্তে বার দিতে আর না পারেন খোদায়।
রচিল রাধা-দাস শোন হকীকত
সেই হৈতে হৈল ইমামের জীআরত॥
ইলাহি আলমিন আল্লা আপনে জানিঞা
অনেক সাধে পএদা আমি করিলাম ছুনিঞা।
বসিতে না পারি আমি তক্তের উপরে
আছমান জমিন বিবি সব জালাইতে পারে।
ইলাহি কহেন জীবরিল কর আর কী
আছমান জমিন ডুবাইছেন রছুলের ঝি।
সিতাব করিঞা এখন ছুনিয়াঁকে যাও
বিবি ফাতেমাকে তুমি যাইঞা সমজাও।
কহিও ফাতেমাএ তুমি এত কেনে কান্দ
আর কহিও আপনার ময়ত আপনি তুমি বান্ধ।
আর কহিও আপনার ইমামে যদি চাও
আছমান জমিনে হে কলম ওর্জুত ছাড়ে দাও।
কহিও আমার কথা বিবি ফাতেমায়
ইমামের দাদ নিজে দিবেন খোদায়।
আর এই পরআনা যাও তুমি নিয়া
এই খত ফাতেমাকে [দিও শু]নাইঞা।
বাজুতে পর বান্দে জীবরিল তখন যায়।
আসিঞা উত্তরিল তখন দস্ত কারবালায়।
ফাতেমা বলেন শুন খোদার পএগম্বর
হত্যা দিব বাবা আমি তোমার উপর।
আগুপাছু ময়ত সভারি দিঞাছেন খোদায়
আমার ইমাম কেনে ধুলাতে লোটায়।

কারু কাচা এলে আমি দিঞাছিলাম পাও
কেবা গাল দিল মুখে যে বেটার মাথা খাও।
সাত রোজ ফাকা আমি রহিলাম অনাহারে
তমুত না করিলাম করচ মুদিনা সহরে।
ধুলামাটি নাহি দেখিলাম বাছা সভের গাএ
সে বাছা পড়িঞা আমার ধুলাএ লোটাএ।
শির কেটে নিঞাছে বাছার কন্দ আছে পড়ে
দস্ত কেটে ইজারবন্দ কেবা নিল কাড়ে।
রছুল বলেন ফাতেমা অগো কান্দ কী কারণ
কেবা রদ করিতে পারে মাগো আল্লার লেখন।
শুন বাবা মাবিআ গোলামকে তুমি দিলে বাদসাই
তার বেটায় মারিলে আমার ইমাম দোন ভাই।
বিবির কান্দনে কান্দে বনের পশুগণ
চান্দ-সুরুজ কাম্পে আর আল্লার আসন।

কৃষ্ণ-বলরামের বাল্যলীলার অনুকরণে হাসন-হোসেনের বাল্যচাঞ্চল্যের দু-একটি কাহিনী গড়ে করেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। এই ধরণের একটি উপাখ্যান, 'ইমামচুরি', অনেকবার ছাপা হয়ে বহুল প্রচারিত হয়েছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যের হরিশ্চন্দ্র-পালার কাহিনী অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাতাকর্ণ-বৃষকেতুর উপাখ্যানে রূপান্তরিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এই কাহিনীর প্রভাব ইস্লামি বাংলায়ও পড়েছিল। তার প্রমাণ বর্দ্ধমান-গোদা নিবাসী আবদুল মতিনের 'ইছলাম-নবী কেচ্ছা'। পুথির লিপিকাল ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, রচনাকাল তার কত আগে তা নির্ধারণ করবার উপায় নেই। দাতাকর্ণ হয়েছেন ইসলাম, বিষ্ণু নবী। রচনা ও ভনিতার নিদর্শন

কাঙ্গালের আরজ মালুম যে তোমাএ
রুটি যে তৈয়ার হল ছাহেবের দোওাএ।
একে শুনিলেন যখন ইছলামের বাণী
না করেন বিলম্ব ছাহেব চলেন আপনি।
আসা বাড়ি হাতে নিলেন খড়ম দোন পাএ
কেরামতের জুব্বা নিলেন দিস্তার মাথাএ।

সঙ্গেতে লইলেন নবী জোমেরা নফরে
করিলেন গমন নবী রাহের উপরে।...
মতিনে রচিল কেচ্ছা আশা নবীর পাএ
চড়িনু সবুরের নাএ কাণ্ডারি খোদাএ॥

মনসামঙ্গল পাঁচালীর প্রভাব পড়েছে ফরিদপুরের অধিবাসী আবদুল রহমানের গুরজামাল-কেচ্ছার শেষ ভাগে। বেহুলার মতই বিবি জুধমেহের পরীদের ইন্দ্রকে খুশি করে মৃত স্বামীর জীব-দান পেয়েছিল।

৮

প্রণয়-গাথা

সিলেট-চাটগাঁর মুসলমানদের মধ্যে হিন্দীমূলক আখ্যায়িকার প্রচলন খুবই ছিল। রোমান্টিক এতভেক্কার-বিহীন বিশুদ্ধ প্রণয়গাথাও এঁরা অনেকদিন অবধি চালু রেখেছিলেন। এই রকম একটি পুরানো এবং ভালো গাথা, নাম 'চন্দ্রমুখী', ছাপা হয়েছিল বহুদিন পূর্বে সিলেটী নাগরী হরফে। রচয়িতা খলিল সম্ভবত সিলেটের লোক ছিলেন। কাহিনীর উপক্রম মৃগাবতী-আখ্যায়িকার মত।

মিছিরনগরের রাজা পুরুষেশ্বরের পুত্র কুমার গুলসুনাহর শিকারে গিয়ে গন্ধর্ব-কন্যা মৃগরূপিণী চন্দ্রমুখীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে সখাদের নিয়ে চলেছিল গন্ধর্বনগরীর উদ্দেশ্যে। নানা দেশ এড়িয়ে তারা পৌছল সেখানে, বাসা নিলে মালিনীর ঘরে। তারপর কুমার মালিনীর বাড়ি থেকে চন্দ্রমুখীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে সুড়ঙ্গ-পথে। রাজকন্যা ও সখীরা তখন ঘুমচ্ছে। কুমারীর খাবার তৈরি রয়েছে। কুমার কন্যার খাবার খেয়ে নিয়ে হাত ধুচ্ছে এমন সময় চন্দ্রমুখী জাগরণোন্মুখ হল। রাজপুত্র সুড়ঙ্গে প্রবেশ করলে। কুমারী জেগে

দেখে খালি ডেগ আছে জল নাহি কুঞ্জাএ
কর্পূর তাম্বুল নাই সোনার বাটাএ।
তর্জন করিলা বালা সখীর উপর
মুনিষ কীরূপে আইল পুরীর ভিতর।

প্রথমে মনে হল অপদেবতার কাণ্ড। তারপর আচম্বিতে জাগল পুরানো স্মৃতি।

এইবারে চন্দ্রমুখী হৈল চমকিত
বামহস্তের অঙ্গুলি কন্যাএ চিবাএ তুরিত।
ঘাও মুখে দারু দিলে আগুনির জালা
জাগরণ করে রাতি গন্ধর্বের বালা।
সেই সে কুমার করি ভাবে মনে মন
আকুল হইআ আইল আমার কারণ।

পরদিন রাত্রিতেও কুমার সেইমত করলে। কুমারী কপটনিদ্রামগ্ন, তার ঘুম ভাঙবার লক্ষণ না দেখে কুমারের সাহস বাড়ল। সে

পালঙ্কে উঠিআ বৈসে সানন্দিত মন।
বাটার তাম্বুল খাএ কিছু নাহি ভএ
খনে অঙ্গে বাড়াএ হাত চঞ্চলহৃদয়ে।
হস্তের অঙ্গুরি ধরি চাএ খসাইবার
হেনকালে জাগি কইন্যা ধরিলা কুমার।

এদিকে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধানে রাজা চার দিকে লোক পাঠিয়েছেন। একজন খুঁজতে খুঁজতে এল গন্ধর্বনগরীতে মালিনীর ঘরে। সেখানে কুমারের সখাদের কাছে সব খবর পেলে সে। কুমার মাসে একবার করে বন্ধুদের দেখতে আসত। এবার এসে চরকে দেখে তার মন কেমন করে উঠল বাপমায়ের জন্যে দেশের জন্যে। কুমারের চোখে জল দেখে বন্ধুরা বললে, কাঁদ কেন, বাড়ি চল। রাজপুত্র বললে, চন্দ্রমুখীকে ছাড়ি কেমনে। মন্ত্রী-পুত্র জগন্বর বললে, মন দড় করে গন্ধর্বকন্যার মায়া কাটাও, দেখ না কেন

এক পুষ্প কিনে কেহ লইক্ষ ধন দিআ
একবার বাস লইআ দলাএ ফেলিআ।
মূর্খ যেই জন হএ শুন নরেশ্বর
ভিন্ন-নারীর প্রেমভাবে যাএ দেশান্তর।

কুমার বললে, চন্দ্রমুখীকে ছেড়ে যাওয়া দুর্ঘট, সে আমাকে একদণ্ডও ছাড়ে না, ঘুমলেও না,

যদি কইন্যা নিদ্রা যাএ আপনার ঘরে
পটুকাএ ছান্দিআ বান্ধে আপনা কোমরে।
হস্তের অঙ্গুলি আমার মুখেতে রাখিআ
বেভুল নিদ্রা যাএ কইন্যা বসনে ঢাকিআ।

জগন্বর উত্তর দিলে, নিজের মাপে ফুলের পুতুল গড়ে চন্দ্রমুখীর কাছে শুইয়ে সরে প'ড়,

যেই না পালঙ্কে শুইআ থাকে চন্দ্রমুখী
সন্ধি করি ফুলের ভেশ তথা যাইও রাখি।

চন্দ্রমুখীর মুখেতে পানের বীড়া দিআ
সে অঙ্গুলি তোমার লইও খসাইআ।
ধীরে চালাইও পাও নিশাভাগ হৈলে
তুরিতে সকলে মিলে যাইমু নদীর কূলে।

তাই করলে কুমার। সন্ধ্যার পর বিছানায় ফুলের পুতুল শুইয়ে রেখে সে চন্দ্রমুখীর কাছে কিছুক্ষণের জন্যে ছুটি নিতে গেল বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবে বলে। কুমার জানে সে প্রিয়াকে ছেড়ে যাচ্ছে তাই তার চোখে জল এল। চন্দ্রমুখী তা লক্ষ্য করে বললে, তোমার মনে কী দুঃখ হল? কুমার বললে, বন্ধুকে সাপে কামড়েছে তাই তার জন্যে ভাবছি। চন্দ্রমুখী বললে, ভাবনা কিসের? এস পাশা খেলি। কি করে, কুমারকে পাশা খেলতে হল। রাত হলে দুজনে শুতে গেল.। চন্দ্রমুখী শেষে ঘুমিয়ে পড়লে

নিষ্ঠুর কুমার তবে চাএ চারি ভিতে
ধীরে ধীরে পটুকার বান্ধ খুলিল তুরিতে।
শুলাইল ফুলের ভেশ করিআ সমান
তুরিতে পানের বীড়া মুখে দিআ তান।

পা টিপে টিপে কুমার সুড়ঙ্গপথে সেঁধল। মালিনীর ঘরে এসে বন্ধুদের সঙ্গে জুটল। সকলে মিলে ঘাটে গিয়ে নৌকা খুলে দিলে দেশের উদ্দেশে।

সকালে উঠে চন্দ্রমুখী কুমারকে ঠেলে জাগাতে গিয়ে কুমারের পলায়ন ব্যাপার বুঝতে পারলে। তখন আর বিলাপ ছাড়া উপায় কি। শোক কতকটা শান্ত হয়ে এলে চন্দ্রমুখী দরবেশ-যোগীর বেশ ধরে বেরিয়ে পড়ল। মালিনীর ঘরে কুমারকে না পেয়ে ছুটল নদীঘাটে। সেখানে দেখলে নৌকা নেই। তখন

কোন দিগে যাএ কইন্যা না পাএ উদ্দেশ
আকুল হইআ কান্দে পাগলের বেশ।

নদীর তীর ধরে দিল ছুট।

এতেক সুন্দর বালা হাঁটিতে না পারে
খনে যাএ লড়.দিআ খনে যাএ ধীরে।...
গাছের ছিকড় লাগি পড়ি পাছাড় খাএ
কোমল চরণ ফাটি লহু বাইআ যাএ।

দুখের উপরে দুখ কত সও আর
বসন ফাড়িআ পদ বান্ধে বারে বার।
কতদূর গিআ পাইল ডিঙ্গা একখান
ভাটি দিয়া যাএ ডিঙ্গা না করে লাগান।

ডিঙ্গা থেকে কুমার বিলাপধ্বনি শুনতে পেলে। তাতে তার মনের বেদনা উথলে উঠল। বন্ধুদের অনুরোধ করলে তীরে নৌকা লাগাতে। বন্ধুরা বোঝাতে লাগল।

অনেক প্রকারে তারা কহিআ বুঝাএ
না শুনে কেওড়ের বোল মরিবারে চাএ।

বাঁক ঘুরতেই নদীতীরে কমনীয়কান্তি নবীন দরবেশ দেখা দিলে। নৌকা থেকে কুমার তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে। দরবেশ বললে, আমার নাম শাহা শইকা, ছিলুম আমি গন্ধর্ব-নৃপতি ফীরুজ-শাহের নগরে,

এতকাল সেই দেশে ভিক্ষা মাঙ্গি খাইলু
আজি নিশি প্রভাতে মুই কান্দন শুনিলু।
তোলপাড় হইছে ভুমি লোকের কান্দনে
যেই শুনে প্রেম-ঝাঠি খাএ সেইজনে।
সে-সবের কান্দন শুনি উদাসিনী হইলু
ধরিতে না পারি হিআ এথা চলি আইলু।

দরবেশকে কুমার নৌকায় তুলে নিলে। চন্দ্রমুখীর অদর্শনে গন্ধর্বরাজপুরীর শোকোচ্ছ্বাসের বর্ণনা দরবেশের মুখে শুনে কুমারের আশা মেটে না, কেবলি বলে, "একে একে কহ তুমি যেন গঙ্গার জল"। দরবেশের কণ্ঠস্বরে তার চন্দ্রমুখীর কথা মনে পড়ে। সে

অন্নজল তেজি মনে কিছু নাহি লএ
চন্দ্রমুখীর নামখানি সদাএ জপএ।

চন্দ্রমুখীর কথা শুনতে চায় বারবার। দরবেশ বলে, শুনে হবে কী,

নয়ন থাকিতে তুমি জনমের আন্ধ
কেমতে চিনিবাএ তুমি গগনের চান্দ।

তারপর সে কুমারকে জিজ্ঞাসা করলে, ভাই তোমার এ হাল কেন? কুমার সব কথা বললে। তখন দরবেশ ভৎর্সনা করলে

একদিন যার সনে যার হএ মিলন
ছাড়ি যাইতে লাগে বেথা পোড়ে তার মন।
নবীন পিরিতি তুমি ছাড়িয়া যাইতে
না লাগিল দয়ামায়া নিদারুণ চিতে।

দুর্বলচিত্ত কুমার দিলে বন্ধুদের দোষ। দরবেশ বললে, পরের বুদ্ধি নিয়ে তুমি মূর্খ গোঁয়ারের মত কাজ করেছ, যে আপনার বুদ্ধি ত্যাগ করে পরের বুদ্ধি নেয় সে তো নিজের ঘরে আগুন দেয়। জগম্বর চটে গিয়ে বললে, তুমি কি রকম দরবেশ, "ঘাওঁ চিনি দারু দেও লজ্জা পরিহরি"। কুমারকে নিতান্ত কাতর দেখে দরবেশ সান্ত্বনা দিলে, "পাইবাএ চন্দ্রমুখী না ভাবিহ আর"। কিন্তু শুষ্ক আশ্বাসে কতক্ষণ থাকা যায়। কুমারের কাতরতা দেখে এক সহচর গন্ধর্বনগরীতে ফিরে যাবার প্রস্তাব করলে। জগম্বর বললে, তাতে হিতে বিপরীত হবে,

নবীন পিরিতি জান নবীন কিরণ
দরশনে বাড়ে মায়া যাবৎ জীবন।...
চন্দ্রমুখী না দেখিআ লইছে দুখের চিন
আদেখা হইলে মায়া ছাড়ে দিন দিন।

একজন বললে দরবেশকে ঠেলে জলে ফেলা দেওয়া যাক। জগম্বর বললে, না, দরবেশকে পেয়ে কুমার কতকটা ধাতস্থ হয়েছে, ও সঙ্গে থাকলে কুমার হয়ত একদিন চন্দ্রমুখীকে ভুলবে।

নৌকা দেশের ঘাটে এসে ভিড়ল। রাজ-সংসারে আনন্দের সাড়া পড়ল। পুত্রের ভাবগতিক রানী জগম্বরের কাছে জেনে নিয়ে রাজাকে অনুরোধ করলে অবিলম্বে কুমারের বিবাহ-উদ্যোগ করতে। "কন্যা জুড়নী" অর্থাৎ বিবাহসম্বন্ধ হল ইন্দ্রের ভুবনে। ইন্দ্রের "আবেশ্বরী"-র (অর্থাৎ অপ্সরীর) সঙ্গে কুমারের বিয়ে হল। কুমার জেদ ধরলে বাসরে দরবেশ তার সঙ্গে থাকবে। রাজা বললে, বাইরের লোক অন্তঃপুরে গেলে

শুনিআ হাসিব মোরে ইন্দ্রের রাজ
কী না কহ পুত্র [তোর] মুখে নাই লাজ।

কুমার নাছোড়বন্দা, বললে, প্রাণের বন্ধু দরবেশকে "এক পল না দেখিলে না রহে জীবন"! রাজাকে রাজি হতে হল। কুমার দরবেশকে নিয়ে গেল অন্তঃপুরে, আর তাকে পাশের ঘরে রেখে সে একলা বাসর ঘরে ঢুকল। কুমারের

কাজ দরবেশ-বেশিনী চন্দ্রমুখীর মর্মান্তিক হল। সে আত্মহত্যা ছাড়া উপায় দেখলে না। মৃত্যুবরন করবার আগে পরী তার পরিচয়টুকু প্রকাশ করতে সঙ্কল্প করলে। দরবেশ-যোগীর বেশ ছেড়ে

সুন্দরবদনে কইন্যা সাজাএ সিংগার
গলাএ তুলিআ দিল গজমোতি হার।...
ঝাড়িয়া মাথার কেশ করিলা সুবেশ
নব-লাখের জাদে কইন্যাএ বান্ধে মাথার কেশ।
আগুনিআ পাটের শাড়ি করিল পরিধান
সর্ব অঙ্গে ছিটাইল আগুরু চন্দন।
নবগুঞ্জের মালা যেন দেখিতে সুন্দর
মুখেতে আরশি জলে নাকেতে বেশর।
নয়ানে কাজল পরে শিরেতে সিন্দুর
দুই পাএ শোভে তান বাজন-নেপুর।

অপরূপ নববধূবেশ ধারণ করে মৃত্যুর দেহলীপ্রান্তে দাঁড়িয়ে চন্দ্রমুখী অন্তরের বেদনাটুকু প্রিয়ের উদ্দেশে নিঃশেষে অঞ্জলি দিলে।

মরণ নিকটে রাখি কান্দে চন্দ্রমুখী
দারুণ কাটারি বালা সম্মুখেতে রাখি!...
নিষ্ঠুর তোর বাপ মাও কঠিন তোর হিআ
আমারে ছাড়িআ আইলা ফুলের ভেশ দিআ।
সঙ্গে আইলু পরিচয় দিলু বারেবার
না চিনিলাএ দুষ্টমতি কি দোষ আমার।
যদি বা থাকিত মনে চন্দ্রমুখী করি
তে কেনে করিত বিআ ইন্দ্রের আবেশ্বরী।...
এ বুলিআ আল্লা নবী করিআ স্মরণ
কাটারি হির্দেতে হানি তেজিল জীবন।

আধরাত্রে ঘুম ভেঙে কুমারের মনে পড়ল দরবেশকে। ডেকে সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখলে চন্দ্রমুখী আত্মহত্যা করেছে। কুমার আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল

পরিচয় দিল কইন্যা চিনিতে না পাইলু
পাইআ অমূল্য নিধি মুই সে হারাইলু।...

যদি মৈল চন্দ্রমুখী চন্দ্রএ বদন
আমার জীবন রাখি কিসের কারণ।

চন্দ্রমুখীর পথ অনুসরণ করলে কুমার।

স্বামীর কাতরোক্তি শুনে নববধূ লজ্জা ত্যাগ করে ধীরে ধীরে এল সে ঘরে। দেখে পালঙ্কের উপরে স্বামীর আর এক পরমসুন্দরীর মৃতদেহ রয়েছে। স্বামী-শোকে হতবুদ্ধি হয়ে নববধূও "সেই সে কাটারি হানি তেজিল পরাণ"। সকালে সখীরা

কেওয়াড় মুকুল করি প্রবেশিলা ঘর
তিন জন মরি রইছন পালঙ্গের উপর।

বিবাহোৎসব-মণ্ডিত রাজপুরীতে শোকের ঝড় বয়ে গেল। তিন দেহ সৎকারের জোগাড় হচ্ছে এমন সময় ইসা নবী সেখানে আবির্ভূত হলেন কাঁদনের রোল শুনে। নবী জিজ্ঞাসা করলেন, "তিনজন মরি আছে কীসের কারণ"। রাজা সব কথা বললে। নবীর হৃদয় গলল, তিনি আল্লার কাছে তিনজনের জীবন ভিক্ষা করলেন। তিনজনে বেঁচে উঠল। পয়গম্বর নিমেষের মধ্যে অন্তর্ধান করলেন। পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়ে রাজা বাজনা বাজিয়ে ঘরে এলেন।

এদিকে গন্ধর্বনগরীর রাজা ফীরুজ-শাহ কন্যা-জামাতার সন্ধানে চর পাঠিয়েছে। ছ-মাস অনুসন্ধানের পর বৃদ্ধ চর মিছিরনগরে কুমারের সাক্ষাৎ পেলে। কুমার অন্তঃপুরে এসে দূতের আগমনবার্তা চন্দ্রমুখীকে জানালে এবং তাকে নিয়ে গন্ধর্বনগরীতে যেতে চাইলে। পিতার অনুমতি নিয়ে কুমার ডিঙ্গা সাজিয়ে চলল সেখানে। ফীরুজ-শাহ মেয়ে-জামাইকে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে এল। এতদিনে

পুরীতে আনন্দ হৈলা অন্ধকার প্রবেশিলা (?)
চন্দ্রমুখী আইলা আপন দেশে
অধম খলিলে কএ সব বাতে দূখী হএ
কন্যা দামান্দ হৈলা আনন্দিত॥

গাথাটির রচনায় বিশুদ্ধ সাধুভাষার ঠাট রক্ষিত হয়েছে। সহজ কবিত্বের পরিচয়ও সর্বত্র রয়েছে। ত্রিপদীতে মিল নেই, এটি একটি বড় বিশেষত্ব।

পূর্ব-ভারতের দুটি প্রান্তে বাংলা-আসামে ও পশ্চিমবিহারে একটি ছোট প্রণয়-গাথা একদা চলিত ছিল। ব্যাপার এমন কিছু নয়, ঋতুসংহারের কাঠামোয় চিরবিরহিণী বালিকা-পত্নীর হৃদয়পরীক্ষা। অল্পবয়সে বিবাহের পর পতি-পত্নীর

মিলন ঘটল না দৈববশে অনেকদিন ধরে। পত্নী রইল বাপের ঘরে, স্বামী গেল বিদেশে বাণিজ্যে। ফিরবার পথে শ্বশুরের গ্রামে নেমে স্বামী ছদ্মবেশে একান্তে পত্নীর প্রণয়প্রার্থনা করতে লাগল বারে বারে নানা প্রলোভনে। পত্নীর নিষ্ঠা কিছুতেই টলল না। তখন দুজনের বহুদিনবাঞ্ছিত মিলন হল। ভোজপুরী লোকগীতে এই গাথা এখনো চলিত আছে, পশ্চিম-বাংলায় উত্তর ও পূর্ববঙ্গে এই গাথা পাওয়া গেছে, আসামেও মিলেছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত গাথাটিই সবচেয়ে পুরানো। এটির রচয়িতার নাম স্বরূপ, সম্ভবত মুসলমান। নায়িকার নাম দামিনী, গাথার নাম 'দামিনীচরিত্র'। উত্তরবঙ্গের গাথাটি সংগ্রহ করেছিলেন গ্রীয়র্সন। এতে পাত্রীর নাম নীলা। অসমীয়া গাথাতেও তাই। আসামের ও উত্তরবঙ্গের গাথার রচয়িতার নাম জয়ধন বনিয়া। কাহিনীর মর্ম এই।

দামিনী (বা নীলা) একদিন গেছে স্নান করতে এমন সময় এক সাধুর পুত্র এসে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে। পরিচয় জেনে সে প্রণয়প্রার্থনা জানালে তার রূপের প্রশংসা করে। দামিনী বিরক্ত হয়ে ঘরে গেল। সেও পিছু পিছু গিয়ে তাদের আতিথ্য নিলে। এমনি করে মাসে মাসে সে ব্যর্থ প্রণয়নিবেদন করতে লাগল নূতন নূতন ঋতু-মাধুর্যের দোহাই দিয়ে। বর্ষশেষে হার মেনে নিজের পরিচয় দিয়ে সাধুপুত্র চলে গেল। দামিনী মাকে সে কথা বললে। মা বুঝলেন আর কেউ নয় জামাই। তখন জামাইকে নিমন্ত্রণ পাঠান হল। তারপর যথারীতি মিলন।

পূর্ববঙ্গের পল্লীবাসী জনগণের মধ্যে রূপকথা-বিমিশ্র প্রণয়গাথার শ্রোতার দল এখনো ভিড় জমায়। গায়কের মুখে ও রচকের কলমে কাহিনী কালে কালে নবরূপোপযোগী ভোল ফিরিয়ে এসেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সংস্কর্তার মানসিক ও সাংস্কৃতিক মাপের ছাঁটাইও পেয়েছে। তাতে স্বল্পবিশিষ্ট সাহিত্য-রসটুকু হয় তলানিতে এসে ঠেকেছে নয় একেবারে গেঁজে গেছে। উদাহরণ ভেলুয়া-সুন্দরীর কাহিনী। এই গাথার আধুনিকতম সংস্করণ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় সঙ্কলিত হয়েছে। কুমিল্লা-নিবাসী মোয়াজ্জেম আলী কৃত পূর্ববর্তী এক সংস্করণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি। এতে বাংলা গাথা কাব্যের একটি বিশেষ পরিণতির নিদর্শন মিলবে।

নায়িকা ভেলুয়া-সুন্দরী তেতৈয়া-নগরবাসী রাজা মনুহরের ও তাঁর পত্নী ময়না-সুন্দরীর কন্যা। বারো বছরের মেয়ে ভেলুয়া অপূর্ব সুন্দরী, "দূরে

থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকুলের পরী"। একদিন সেখানে নৌকা করে শিকারে এল শামলাবন্দর নিবাসী মানিক সদাগরের পুত্র তরুণ আমীর সদাগর। প্রথমেই তার শিকার মিলল ভেলুয়ার "হাউসের কবুতর"। সে কবুতর নয় লাখ কবুতরের সর্দার, "কলেমা তৈয়ব সদা মুখে পড়ে তার"। আহত কপোত এসে আশ্রয় নিলে ভেলুয়ার বুকে। ভেলুয়া কাঁদতে লাগল। কাঁদন শুনে তার সাত ভাই যুদ্ধ করে আমীরের দলবল বিধ্বস্ত করলে আর আমীরকে ধরে বন্দী করে রাখলে তার বুকে সাতমনি পাথর চাপিয়ে। ভেলুয়ার মা তাকে বোনপো বলে চিনতে পেরে ছেলেদের বললে।

> ভেলুয়ার মায়ে যখন একথা কহিল
> সাত ভাইয়ের গোস্বা সব পানি হৈয়া গেল।

পূর্বসত্য স্মরণ করে ভেলুয়ার মা কন্যাকে আমীরের হাতে সঁপে দিলে। নববধূকে নিয়ে আমীর বাড়ি ফিরে এল। আমীরের এক আইবুড় বোন ছিল নাম বিবলা। সে কুরূপা নয়, তার ধর্মজ্ঞানও আছে। তবুও

> শাশুড়ী ননদী জান যার ঘরে আছে
> কোনমত সুখ নাই সেই বধূর কাছে।

নববধূর সুখসৌভাগ্য ও আমীরের আনন্দ-উচ্ছ্বাস বিবলার ভালো লাগল না। সে মাকে লাগালে

> ঘাটে রৈছে ঘাটের ডিঙ্গা সাধু-ভাই নষ্ট হৈয়া যায়
> দাঁড়ি মাঝি যত আছে তারা বৈয়া মাহিনা খায়।

মা ভাবলেন তাই তো। ছেলেকে অনুযোগ করে বললেন,

> হাল্যার পুত্র নহে রে সাধু হাল চষি খাইতা
> জাল্যার ছেলে নহে রে তুমি জাল যে বাইতা।
> সুন্দরবধূ পাইয়া রে সাধু বাণিজ্য পাসরিলা
> সদাগরের পুত্র হই ঘরে বসি রৈলা।

আমীর লজ্জা পেলে। সে আজ যাব কাল যাব করে গড়িমসি করতে লাগল। বিবলা লক্ষ্য করে প্রত্যহ যাত্রার মুহূর্তে ভেলুয়াকে দেখে আমীরের মন বিগড়ে যায়।

> ফজরে উঠিয়া বিবলা নিরক্ষিয়া চায়
> ভেলুয়ার হাতে সাধু পানের খিলি খায়।

এই মত দেখিয়া বিবলার বাড়িল বিদ্বেষ
আপনে ছিঁড়িয়া ফেলে আপন মাথার কেশ।
আমীর সাধু বলে ভৈন খোদার কছম লাগে
উজানী-নগরে যাইমু কালি ফজরের আগে।
এই কথা কহিয়া সাধু ভেলুয়ার দিগে চায়
সুন্দর মুখ দেখি সাধু বাণিজ্য পাসরিয়া যায়।

শেষ পর্যন্ত বাণিজ্যে বেরতেই হল। আমীর মাকে বলে গেল, ভেলুয়াকে যত্ন করো, তার দোষ নিও না, আর

না দিও গোবর ফেলিতে কন্যার গায়ে দাগ লাগিবে
না দিও উঠান কুড়াইতে কন্যার পায়ে ধূল পড়িবে।
মরিচ বাঁটিতে না দিও ভেলুয়ার হাত যে জলিবে
না দিও পানি আনিতে কন্যার গায়ে বেথা হইবে।

বাপকে অনুরোধ করলে, "ভেলুয়ারে জানিবা তোমার কন্যার মতন"। ভেলুয়াকে বললে, এই আশা অপূর্ণ রয়ে গেল যে তোমার হাতের রান্না খেলুম না। ভেলুয়া বললে, সাত দিন হল আমাকে বিয়ে করে এনেছ, এর মধ্যে শাশুড়ী-ননদ আমাকে রাঁধতে দেয় নি, যাই হোক তোমার খেদ মেটাচ্ছি। ভেলুয়া বরণডালার চাল বেছে নিলে, বাগান থেকে নারকেল পাড়িয়ে আনলে। সেই নারকেলের জলে ভাত রেঁধে স্বামীকে খাওয়ালে, নিজেও খেলে। খাওয়া হলে আমীর ভেলুয়াকে দিয়ে তামাক সাজিয়ে আগুন আনতে বললে। ভেলুয়া বললে, পারব না। তখন "হোক্কা-নলের বাড়ি সাধু ঘেষিয়া মারিল"। মার খেয়ে ভেলুয়া বেহুঁশ হয়ে ঢলে পড়ল পালঙ্কে। এই সুযোগে আমীর এসে চড়ল ডিঙায়। মাঝি আমীরের মুখ দেখে বুঝলে তার মনোভাব। সে বললে

ভেলুয়ায় হাতে বুঝি না দিছে পান ফুল
তেকারণে সকলের দিশা হরে ভুল।

এর জবাব না দিয়ে আমীর নৌকা ছাড়তে হুকুম দিলে। ডিঙ্গা চলল সারা রাত। মাঝিরও ভবিষ্যদ্বাণী ফলল। সকাল হলে দাঁড়ি-মাঝিরা দিশা পায় না। জ্যাকব্সের গল্পের মত দাঁড়ি-মাঝিরা মদ খেয়েছিল কিনা জানি না তবে নিশ্চয়ই নৌকার কাছি খোলা হয়নি। সুতরাং ঘাটে বাঁধা থেকেই সারারাত্রি দাঁড় টানা হয়েছিল। নিজের দেশকে অচেনা বিদেশ মনে করে ঘাটে জল নিতে এসেছে যে নিজেদের মেয়েরা তাদের দাঁড়ি-মাঝিরা বললে, এ কোন দেশে এলুম?

স্ত্রীরে ডাকে মায়ের নামে মায়ে ডাকে নানী
কোন দেশে আসিলাম কহ তবে শুনি।
এই কথা শুনি বধূ সব হাসে খল খল
আমীর সাধুর দাঁড়ি-মাঝি তারা হইছে পাগল।

গৌরল ধর মাঝি আমীরকে বললে, বাড়ি গিয়ে ভেলুয়াকে বিদায় সম্ভাষণ করে এস। সাধুকে দেখে ভেলুয়া হাসতে লাগল। বললে, বাণিজ্য করে এলে, "কত টাকা লাভ পাইয়াছ আমার কাছে বল"। তার পর পান-গুয়া দিয়ে ভেলুয়া স্বামীকে শুভযাত্রা করালে। আমীর চলে গেলে ভেলুয়ার মনে বিরহের আগুন জলে উঠল। সে কাঁদতে লাগল

আমারে ছাড়িয়া গেলা মাছলি-বন্দর
মলিন না হৈছে আমার হৈলদের-চাদর।

তার পর সে শির্‌নি মানত করলে কালুর ও গাজীর নামে এই বলে, "আমীর সাধু আনি দেও আমার মোকামে"। ভেলুয়ার প্রার্থনা শুনে

কালু-শা উঠিয়া বলে গাজী ভাই ফকীর
ভেলুয়ার শির্নি খাওয়াও করিয়া শিগগির।
তোমার নামে ভেলুয়া ও ভাই শির্নি মানসা করে
না খাওয়াইলে শির্নি গদা মারিমু মাথার উপরে।

গদার ভয়ে গাজী ডাক দিলেন বিহঙ্গমকে। বললেন, রাত্রিতে আমীরকে পিঠে করে ভেলুয়ার কাছে নিয়ে যেও আর সকাল হবার আগেই ডিঙায় ফিরিয়ে এনো। বিহঙ্গম আমীরকে ভেলুয়ার কাছে এনে দিয়ে বললে, আমি এসে তিনবার ডাক দেব, তার মধ্যে তোমাকে চলে আসতে হবে। পাখীর ডাক শুনে আমীর তাড়াতাড়ি চলে এল। ঘুমের আবেশে ভেলুয়া ঘরের দরজা বন্ধ করতে গেল ভুলে। সকালে বিবলা দেখলে ভ্রাতৃবধূর ঘর খোলা। মা-বাপকে ডেকে এনে দেখিয়ে বিবলা বললে

বাণিজ্যেতে গেল ভাই মোর সাত দিন হৈল
সুন্দর সতী ভেলুয়ারে কোন রসিকে পাইল।

চেঁচামেচিতে ভেলুয়ার নিদ্রাভঙ্গ হল। সে বললে, কাল রাত্রিতে আমার স্বামী এসেছিল। একথা শুনে সকলে হেসে উঠল। ভেলুয়ার কি শাস্তি হবে সে বিষয়ে এক এক জন এক এক রকম মত দিলে। শেষে বিবলার মতই ধার্য হল। ভেলুয়াকে দাসীর কাজে নিযুক্ত করা হল—গোয়াল কাড়া, উঠান ঝাঁটানো, লঙ্কা বাটা ও জল তোলা, যা যা আমীর নিষেধ করে গিয়েছিল।

একদিন ভেলুয়া গেছে নদীতে। স্নান করে সে চুল শুখোচ্ছে এমন সময় ভোলা সদাগর নৌকা করে ফিরছিল মাছলিবন্দর থেকে। সে ভেলুয়াকে দেখে মুগ্ধ হল এবং তার পরিচয় জেনে নিয়ে বললে যে তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। ভেলুয়া সে কথা বিশ্বাস করলে না। ভোলা তাকে জোর করে নৌকায় তুলে নিলে। কামদৃষ্টিতে ভেলুয়ার দিকে চাওয়ায় তার চোখ হল কানা। ক্ষমা ভিক্ষা করায় সুস্থ হল। দাঁড়ি-মাঝিদের মধ্যস্থতায় ভেলুয়ার উপর আর অত্যাচার করতে ভোলা সাহস পেলে না। তাকে ঘরে নিয়ে গেল কট্টালী-নগরে। নৌকা থেকে ভেলুয়া পত্র পাঠালে স্বামীর কাছে খোওাজ পীরের মারফৎ। এদিকে আমীর বাড়িতে ফিরে শুনলে ভেলুয়া মরে গেছে। তার বিশ্বাস হল না। কবর দেখতে চাইলে। বিবলা কবর দেখিয়ে দিলে। আমীর কবর খোঁড়ালে। তার থেকে বেরল কালো কুকুরের দেহ। তারপর ভেলুয়ার চিঠি তার হাতে এল। দুঃখে ক্ষোভে আমীর গৃহত্যাগ করলে। ফকীরের বেশ ধরে সারিন্দা বাজিয়ে চলল কট্টালী-নগরে। সারিন্দার তিন তার

> এক তারে বলে আমি আমীর সদাগর
> আর তারে বলে আমার ভেলুয়া সুন্দর।
> আর তারে বলে দুষ্ট ভোলা সদাগর
> লুটিয়া নিয়েছে আমার ভেলুয়া সুন্দর।

আমীর যে দিন কট্টালী-নগরে হাজির হল সে দিন ভোলা ভেলুয়াকে বিয়ে করবে। সখীর মুখে ভেলুয়া ফকীরের কথা শুনলে, জলের কলসীতে আমীরের আংটি পেলে। বুঝলে আমীরই ফকীর। সে ভোলাকে বললে, বিয়ে বন্ধ কর, বাপের দেশের এক ফ'করে এসেছে, আজ তার গান শুনব,

> তেরি মেরি কৈলে তোমার চক্ষু হবে কানা
> গীত শুনিবারে তুমি না করিবা মানা।

ভোলা ভয় পেলে। ফকীর হাজির হলে ভেলুয়া তাকে দেখে কাঁদতে লাগল। তার পর

> নানান গীত গায় ফকিরা নানান ভেশ ধরে
> ফকিরারে দিছে বাসা ভেলুয়ার কোঠা ঘরে।

নির্জনে নিশীথে পতিপত্নীর সাক্ষাৎ হল।

> সাধু বলে ভেলুয়া বুকে লইল টানি
> মুকুতা-ঝরনি ঝরে কন্যার দুই নয়নের পানী।

সকালে ফকীর গেল মুনাফ কাজীর কাছে ভোলার বিরুদ্ধে স্ত্রী-অপহরণের আর্জি নিয়ে। কাজী সাহেবের হুকুমে "ওয়ারণ্ট যাইয়া তবে ভোলাকে আনিল"। কাজী ভোলাকে বললে

> ফকিরের বধূরে তুমি আনিয়াছ লুটিয়া
> গরীব-দুখিয়ার বধূ আনি তুমি কর বিয়া।

ভোলা জবাব দিলে

> ঘরে ঘরে যাই ফকিরা নানান গীত গায়
> পেটের কারণেতে সারিন্দা বাজায়।
> দেশে দেশে হাটে ফকিরা নানান ভেশে রয়
> যার বধূ সুন্দর দেখে ফকিরা তারে বধূ কয়।
> আমার বধূ দেখি ফকিরা বেহুশ হইয়া
> তোমার কাছে নালিশ করে ভেলুয়ার লাগিয়া।

কাজী হুকুম দিলে ভেলুয়াকে আনতে। ভেলুয়া এল পালকি করে। কাজী প্রশ্ন করলে তাকে, তোমার স্বামী কে? সে বললে, ফকীর আমার স্বামী। ভেলুয়ার কথা শুনতে কাজী পালকির দিকে চাইলে, দেখতে পেলে শুধু তার কড়ে আঙ্গুল।

> নব্বই বৎসর হইছে কাজি শতের বাকি দশ
> বাম হস্তের আঙ্গুল দেখি কাজি হইছে বেহুশ।

ভোলাকে গালাগালি করে তাড়িয়ে দিয়ে আমীরকে বললে, ভেলুয়াকে আমার কাছে রেখে তুমি ঘরে চলে যাও। এ কন্যা তোমার যোগ্য নয়, তোমারি কাছে থাকলে একে কেউ লুটে নেবে। অন্তরে ক্রোধের জ্বালা নিয়ে আমীর সেখান থেকে চলে এসে গৌরল ধর মাঝিকে চিঠি দিলে লোকজন নিয়ে চলে আসতে। লোকজন দেখে কাজী ভয় পেলে। আমীর ভেলুয়াকে ডিঙায় নিয়ে এল। ভোলা

এল কেড়ে নিতে। মারামারিতে যুদ্ধে ভোলার পরাজয় ও মৃত্যু হল। ভেলুয়ার কথায় আমীর ভোলার ভিটায় এক দীঘি কাটালে কটালী-বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন রূপে।

ভেলুয়ার নামে রে দিঘি দিল সদাগর
কোম্পানীতে বান্ধিয়াছে ইষ্টিশিনের ঘর।

ভেলুয়াকে নিয়ে সদাগর দেশে ফিরল। মা-বোন বললে সতীত্বের পরীক্ষা না দিলে বধূর ঠাঁই হবে না ঘরে। ভেলুয়া অনেক পরীক্ষা দিলে। প্রথম পরীক্ষা লোহার চালের ভাত রান্না, শেষ পরীক্ষা তুলাদাহ। ভেলুয়াকে তুলার গাদার উপর বসিয়ে ঘি ঢেলে আগুন দেওয়া হল। আগুন নিবলে দেখা গেল ভেলুয়া নেই। পবন তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে পরীর দেশে রোকাম-শহরে। ভেলুয়াকে না দেখে আমীর বিলাপ জুড়লে,

কৈ গেলা কৈ গেলা আমার জীবের জীবন
কৈ গেলা কৈ গেলা আমার সুন্দরবদন।
কৈ গেলা কৈ গেলা আমার চক্ষের রৌশনী
কৈ গেলা কৈ গেলা মোর পরাণের পরাণী।

ঘর ছেড়ে সে বেরল ভেলুয়ার উদ্দেশে। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে দেখা হল এক ফকীরের সঙ্গে। তার অবস্থা দেখে ফকীরের দয়া হল। ফকীর বললে ভেলুয়া আছে সাত বোন পরীর আশ্রয়ে। সেই পরীরা ফকীরের শিষ্য। তারা প্রায়ই আসে ফকীরের দোয়া নিতে। ফকীর আমীরকে এক টুপি পরিয়ে দিলে, তাতে সে সকলের অদৃশ্য হল। তারপর যখন পরীরা এল তখন ফকীরের উপদেশ মাফিক সে অদৃশ্য টুপি পরে আলোক-রথের নীচে-তলায় বসে রইল। পরীরা ভেলুয়াকে নিয়ে গেল ইন্দ্রের সভায় নাচ দেখাতে। অদৃশ্যে আমীরও তাদের সঙ্গ নিলে। একজন মার্দঙ্গিক ভালো বাজাতে পারছিল না। তার যন্ত্র ধরে টানতে লাগল আমীর।

কোন জনে টানে মৃদঙ্গ নাহি দেখা যায়
মনে মনে ডরি বাজন্যা মৃদঙ্গ ফেলিয়া ধায়।
গাঁজাখোর বাজন্যা যদি গাঁজা খাইতে গেল
আমীর সাধু লইয়ে মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিল।
ইন্দ্রকুলের বাজা সাধু জানে নানা তাল
ইন্দ্ররাজায় শুনি বাজনা হইল খোশাল।

নাচ শেষ হল, নাচনীরা বখশিশ পেলে। মৃদঙ্গ কিন্তু বেজেই চলেছে অদৃশ্য হাতের আঘাতে।

ইন্দ্ররাজায় বলে মৃদঙ্গ বাজনা ক্ষেমা কর
নাহি শুনে মানা বাজায় আমীর সদাগর।
ইন্দ্ররাজার পূজার সময় নষ্ট হইয়া যায়
যত মানা করে সাধু অধিক বাজায়।

অবশেষে ইন্দ্র শাপ দিতে উদ্যত হলে ভয় পেয়ে আমীর টুপি খুললে এবং ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করলে, "সুন্দর ভেলুয়া দিয়া আমার রাখহ জীবন"। ইন্দ্র শুনেছেন ভেলুয়ার বিবাহ হয় নি। এখন আমীরের কথা শুনে তাঁর রাগ হল, শাপ দিয়ে ভেলুয়াকে পাথর করে দিলেন। অঘটন দেখে আমীর ইন্দ্রের পা জড়িয়ে ধরলে। ইন্দ্র শান্ত হয়ে বললেন, এক বছর গেলে আবার মানুষ করে দেব। সাধু এক বছর রোকাম-শহরে কাটিয়ে বছর পূরলে ইন্দ্রের সভায় হাজির হল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইন্দ্র ভেলুয়ার শাপমোচন করলেন। ভেলুয়াকে নিয়ে আমীর আপন ঘরে ফিরে এল।

৯

পীর-মাহাত্ম্য গাথা

কোন কোন রূপকথা-কাহিনী পশ্চিমবঙ্গের কবিদের হাতে পীর-মাহাত্ম্য-কাহিনীতে উন্নীত হয়েছিল। আরিফের 'লালমোনের কেচ্ছা' এবং ফকীররাম কবিভূষণের 'শশিসেনা (বা সখীসোনা) এই ধরণের রচনা। আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক অজ্ঞাতপূর্ব রচনার পরিচয় দিচ্ছি। এটি দু-পালার ছোট পাঁচালী কাব্য। নাম 'মানিকপীরের গীত'। রচয়িতা "আজিমাবাজ ধানশিস্তা"-নিবাসী ফকীর মহাম্মদ, পিতার নাম রহিম। পুথি পশ্চিমবঙ্গের, হিন্দুর লেখা। রচনাকাল আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ।

মানিক-পীরের উদ্দেশে মাথা নত করে কবি বলছেন যে ব্যাধিগণ সৃষ্টি করে আল্লা মুশ্‌কিলে পড়লেন, তাদের বাগ মানায় কে। ইলাহি জিবরাইল বললেন, মক্কায় যত পীর-পয়গম্বর আছেন তাঁদের ডেকে আন। আল্লার হুজুরে এসে "আউল্যাগণে কহে বাত ছাতি পরে দিয়া হাত তলব করহ কার তরে"। ইলাহি বললেন, "শুন সভে এই মত ব্যাধিগণে লেহ উঠাইয়া"। তাঁরা নিজেদের অক্ষমতা অনুভব করে হেটমাথা হয়ে রইলেন। তখন

> বাতুনে মানিক ছিল এলাহি মাঙ্গায়্যা নিল
> ব্যাধি স্বপিয়া দিল তারে
> ব্যাধিগণ লয়্যা যত তাহা বা কহিব কত
> যান দেওান দুনিয়ার উপরে।

তাঁর সঙ্গী হল হরজ অলি। মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে

> মানিক বলেন শুন হরজ অলি ভাই
> জাহির খাতিরে কহ কোনখানে যাই।
> হরজ অলি বলে যদি পুছিলে আমারে
> আগে গিয়া মুর্সিদ হও মক্কা শহরে।

> মুর্সিদ হইলে ভাই মানবে দিবে ক্ষীর
> যেথানে সেথানে শেষে করিব জাহির।

এই পরামর্শ মানিক গ্রহণ করলেন।

> ভাল ভাল বলিয়া মানিক দিল সায়
> কালিয়া দিস্তার পীর বান্ধিল মাথায়।
> নির্গুণ ফকীর মর্দ ছিঁড়া কাঁথা গায়
> ঘন ঘন মাছিগুলা উড়ে হাতে পায়।
> আবিল আসা হাথে নিল উঠাইয়া।
> দম দম মাদার বলে যায় নেকলিয়া।

মক্কায় পৌঁছবার আগেই নমাজের বেলা হল। জঙ্গলের পাশে নদীর ধারে একান্তে গুধড়ি আসা-বাড়ি ও সোনার খড়ম রেখে দুজনে বসলেন নমাজে। সেই সময়ে দুখিয়া ও তার মা এসেছে জঙ্গলে গোরু চরাতে। দূর থেকে মানিক-অলিকে নদীর কিনারে নমাজ পড়তে দেখে দুখের কৌতূহল হল। মাকে বললে, "কেমন করে নমাজ পড়ে দেখ্যা আসি আমি"। একটু এগিয়ে যেতেই সোনার খড়ম দুটি নজরে পড়ল।

> সোনার খড়ম দেখ্যা দুখ্যা বড় খোশাল মন
> সোনার খড়ম চুরি করিল তখন।
> সেই দুটি খড়ম যে বগলদাবা কিয়া
> মামাজীর হুজুরে খপর কয় গিয়া।

মা দেখে ভর্ৎসনা করলে, "ফকীরের খড়ম তুঞি কেন নিঞা আলি",

> এই খপর শুনে যদি ফকীর দেওান
> চোর-দায়ে ধরে লয়্যা মারিবে গর্দান।

দুখে বললে, "চুরি করে লয়েচি ফকীর জানে নাই"। মা নিরুত্তর হল। দুখে রাজার বাজারে গেল খড়ম বেচতে। বেনে ফকীরের সোনার খড়ম কিনতে ভীত হল, অমনিই দুখেকে কিছু টাকা দিলে, বললে

> শহর ভিতরে বাবা কেন দুখ পাও
> এই টাকা ভাঙ্গাইয়া ঘরে গিয়া খাও।
> কাঙ্গাল বান্যা আমি শুন মোর ঠাঞি
> স্বর্ণের খড়মে আমার কাজ নাই।

সেই টাকায় হাট-বাজার করে ঘরে এসে

দুখ্যা বলে মামাজী শুন গো জননী
নাড়িয়া ফকীরের খড়ম জোউরার ধনি।
এ দুটী খড়ম নিঞো যেইখানে যাই
খড়ম দেখালে কিছু টাকা-কৌড়ি পাই।
টাকা-কড়ি দেই সভে শুন মোয় ঠাঞি
ফকীরের খড়ম মাগো কেহ লেই নাঞি।
দুখ্যার মা বলে তোমার ভাগ্যের নাঞি ওর।
ফকীর মাহাম্মদ বলে নসীবের জোর॥

মাতা-পুত্রের ভোজন সমাধা হল। পুত্র নূতন কেনা পালঙ্কে শুয়ে বিশ্রাম করছে এমন সময় মানিক-পীর এলেন খড়মের সন্ধানসূত্র ধরে। ফকীরের জিগির শুনে দুখের মা বেরিয়ে এসে বললে, "এক কড়া ঘরে নাই ভিক্ষা দিব কি"। ফকীর বললেন, ভিক্ষার জন্যে আসি নি, "এমন মেগ্যা-খেকো যে ফকীর মোরা নই", তোর বেটা দুখেকে ডেকে দে। দুখের মা উত্তর দিলে, "সাত রোজ বেটা মোর ঘরে আইসে নাঞি"। ফকীর বললেন, তোর বেটা তো ঘরে শুয়ে রয়েছে। দুখের মা দমবার নয়, বললে, আমার বেটা ঘরে আছে জানলে কিসে? তোমরা ফকীর নও, "দিনে দেও কাঁথা গায়ে রাত্রে হও চোর",

পাড়াপড়শীর কিরে করি তোমার তরে
তোমার মাথার কিরে বেটা নাঞি ঘরে।
খুবি চাও উঠে যাও দরজা ছাড়িয়া
বসিয়া রহিলে কেন কিসের লাগিয়া।

মানিক ধমক দিলেন, আমার সঙ্গে কপট চাতুরি করছ। কাঁদতে কাঁদতে এসে দুখের মা ছেলেকে অনুযোগ করে বললে

তখনি করিলাম মানা শুন মোর ঠাঞি
ফকীরের খড়ম আনিলে ভাল হবে নাঞি।
কাহে-কো আন্যাচ খড়ম ঝকমারি কিয়া
এসেছে ফকীর তুমি জবাব দেও গিয়া।

দুখে বাইরে এসে ফকীরকে বললে, মেয়েছেলেকে পেয়ে জঞ্জাল করছ কেন? আমি সাত দিন পরে এইমাত্র ঘরে ফিরলুম, তুমি কেন বিরক্ত করতে এসেছ।

ফকীর বললেন, চালাকি রাখ, "সোনার খড়ম কাঁহা নিকলিয়া আন"। দুখে বললে, ভাঁড়াব না, তোমার খড়ম এনেছি। তারপর সে ফকীরকে নিজের দুঃখের কথা শোনাতে লাগল। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে যে কাঙাল দেখে তার সঙ্গে কেউ বেটির বিয়ে দেয় না। তার মনের সাধ, খড়ম বেচে বিয়ে করব। মানিক-পীর মনে মনে হেসে বললেন, বীরসিংহ রাজার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দেব, আমার খড়ম এনে দে। দুখে বললে

বাগদির ছেল্যা আমি শুন শাহাজী
রাজকন্যা কাঙ্গাল দুখ্যার কাজ কি।
বাগদির মায়্যা এ পৃথিবীতে আছে
করিব তাহারে বিভা যাব তার কাছে।
বাগদির মায়্যা বিভা করি মাছেভাতে খাব
রাজকন্যা বিভা করি পরান হারাব।

ফকীর বিরক্ত হয়ে বললেন, যা খুশি কর, ভাল চাস তো আমার খড়ম এনে দে। দুখে উত্তর করলে, কে তোমার খড়ম নিয়েছে?

পরিহাস্য করেছিনু শুন শাহাজী
সাহেবের খড়মে আমার কাজ কি।

মানিক বেনের কাছে টাকা নেওয়ার কথা ফাঁস করলেন। তখন দুঃখে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলে, বললে

যত্যপি করিব বিভা কি বলিব আমি
জমিন উপরে থুক ফেল্যা দেহ তুমি।
তোমার মুখের ছেপ নাহি শুখাইবে
আমার সমন্দ করি এখনি আসিবে।

তিন সত্য করে পীর চললেন ব্রাহ্মণের বেশ ধরে

গলায় পৈতে দিল কপালেতে ফোটা
হাথে নিল পাজিপুথি মাথাভরা জটা।

রাজার সভায় উপস্থিত হলে সকলে সম্ভ্রমে প্রণাম করলে। ব্রাহ্মণ রাজার পাদবন্দনা গ্রহণ করলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করলে মানিক বললেন, তোমার ঘরে বার-বছরের মেয়ে আছে আইবুড়ো,

যুগ্য কন্যা তোর ঘরে বাত শুনে নে
তোকে ছোঁঞে্য পাজি রাজা জল খায় কে।

পীর তখনি রাজকন্যার সম্বন্ধ প্রস্তাব করলেন,

গঙ্গা-রাজা একজন শুন মন দিয়া
আস্যাচে তাহার বেটা শিকার লাগিয়া।
দুর্গতনন্দন তার নাম শুন মোর ঠাঞি
অমন কুলীন রাজা আর পাবে নাঞি।

রাজা ব্যগ্র হল এমন উপযুক্ত পাত্রে কন্যা-সম্প্রদান করতে। ঘটক ঠাকুর বললেন, কুলীনের হাতে মেয়ে দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার,

যেই বাড়ি আসিবে সেই শুন ফরমান
না কর বিলম্ব তারে কন্যা দিবে দান।
যদি কিছু বিলম্ব হয় কি কহিব আর
ঘরে তার মা বাপ পাইবে সমাচার।
তারা যদি খপর পায় শুন মোর ঠাঞি
তবে আর তোমার বেটির বিভা হবে নাঞি।

কন্যা দেবার জন্যে রাজাকে তিন-সত্য করিয়ে নিয়ে মানিক দুখের কাছে ফিরে এলেন ফকীর-বেশ নিয়ে আর বললেন, "তোমার সমন্দ কর‍্যা আনু রাজার দরবারে"। ফকীর এই গেল এই এল দেখে

দুখ্যা কয় ভাল নয় নাড়িয়া ফকীর
পথ হৈতে ফিরে আইলে করিয়া ফিকির।
কে জানে কাহার বাড়ি ছিলে লুকাইয়া
ঝুট-মুট কহ আইলে সমন্দ করিয়া।
সমন্দ কর‍্যাছ কোন রাজার দরবারে
কেমন রাজার কন্যা দেখাবে আমারে।

মানিক বললেন, "বেহা না হইলে আগে কন্যা দেখায় কে"। পাঁচ দিনের মধ্যে তার বিয়ে হবে শুনে

দুখ্যা বলে শাহাজী শুন মোর ঠাঞি
বাগদির বেহা তুমি কিছু জান নাঞি।

পাড়া পড়শির বাড়ি বুঝিবারে যায়
হলদি-তেল মাখ্যে আর খীর-পিঠা খায়।
আমি যদি করিব বিভা মন দিয়া শুন
হলদি-তেল খীর-পিঠ্যা মাঙ্গাইয়া আন।

মানিক বললেন, তুই আমার মাথা খেলি, "হলদি-তেল খীর-পিঠ্যা বলে পাব কোথা"। দুখে উত্তর করলে, "তোমার মাথা খাইলে আমার বিভা হবে নাঞি"। মানিক ঠেকেছেন খড়মের দায়ে। করেন কি, "আসমানের চারি শৈলি" ডাকিয়ে এনে তাদের দিয়ে সব জোগাড় করালেন। তেল-হলুদ মেখে পেট ভরে খীরপিঠে খেয়ে দুখের খেয়াল হল, "ধোব দাঁত কেমনে দেখাব রাজার দুয়ারে"। পীরকে বললে, দাঁত-রাঙ্গার পাতা কোথা মাঙ্গাইয়া আন"। মানিক তাই করলেন। তার পর দুখে বললে, দাঁত রাঙা হল কিনা বুঝব কিসে। মানিক বললেন, থালায় জল ঢেলে মুখ দেখ।

শুনিয়া দুখিয়া মরদ কোন কাম কৈল
থালের উপরে পানি উঠাইয়া নিল।
আপনার দাঁত রাঙ্গা দেখে সেইখানে
দাঁত রাঙ্গা দেখি দুখ্যা খোশাল হৈল মনে।

তখন সে মনে মনে স্বীকার করলে, "নাড়া শেখ ভাল মানুষ বটে।" তারপরে মনে পড়ল বাজনা-বাদ্যির কথা। অমনি

দুখ্যা কহে শাহাজী কহি তোমার ঠাঞি
গুড়গুড় করিয়া যায় তাহা হল্য নাঞি।
শুনিয়া মানিক জিন্দা কোন কাম কিয়া
আরসের বাজনা যত নিল মাঙ্গাইয়া।

তারপর আতশবাজি।

দুখ্যা বলে শাহাজী শুন মোর ঠাঞি
ফরফর করিয়া উঠে তাহা হল্য নাঞি।

মানিক আতশবাজি জোগাড় করলেন। তার পরে দুখে বাহানা ধরলে, "আঁধারে কেমনে যাব রাজার দরবারে"। মানিক-পীর বনের বাঘ জড় করে তাদের হাতে মশাল দিয়ে বরকে নিয়ে রওনা হলেন। রাজবাড়ির একটু তফাতে

বরযাত্রীদের থামিয়ে পীর বামুনের বেশ ধরে গিয়ে রাজাকে বললেন, "বৈরাত বসিবে কোথা দেহ দেখাইয়া"।

শুনিয়া বীরসিংহ রাজা কোন কাম করে
আগাইয়া দেখে গিয়া ময়দান উপরে।
নেহাত করিয়া দেখেন বনের বাঘওান
দেখিয়া বীরসিংহ রাজার উড়িল পরাণ।
বীরসিংহ কহে কথা শুন ঠাকুরজী
জামাই আর তুমি আসিবে লোকে কাজ কী।

মানিকও তাই চান। তিনি বনের বাঘদের সেইখান থেকেই বিদায় দিয়ে দুখেকে নিয়ে বিবাহসভায় এলেন। রাজা সোনার বিছানা দেখিয়ে দিলে জামাইকে। ভয় পেয়ে দুখে বসে পড়ল মাটিতে। তাই দেখে এক গোলাম অন্তঃপুরে গিয়ে বেগমকে বললে, রাজার জামাই বিছানা ছেড়ে মাটিতে বসেছে। দুখের কাণ্ড দেখে পীর নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না, তার গালে কসে দুই চড় লাগালেন। দুখে কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় উঠে বসল। পীরের মাহাত্ম্যে এ ঘটনা কারো নজরে পড়ল না। তারপর জামাইকে ভোজনে বসানো হল। পঞ্চ উপকরণযুক্ত কাঞ্চনের থালা সামনে করে

কান্দে দুখিয়া মরদ হৈয়া জারজার
ঝালের ব্যঞ্জন খাইতে নাত্রি পারি আর।

মানিক-পীর বিপদ গুণলেন, না বুঝে গোরুর রাখালকে এনেছি রাজকন্যার বর করে, "বাক্যমন্ত্র রাখাল বেটা পড়িবা কেমনে"। রাজা লোকজনদের বললেন, জামাইকে নিয়ে এস, কন্যার হাতের সঙ্গে তার হাত নোতুন কাপড়ে বাঁধ। পীর দেখলেন সমূহ বিপদ, হাত বাঁধাবাঁধি হলে রাখাল বেটাকে থামান ভার হবে। তিনি রাগ দেখিয়ে বললেন, "অমন বেবস্তা দেখ আমা সভার নাত্রি"। রাজা শুধলে, আপনাদের ব্যবস্থা কি প্রকার?

বামুন বলেন বাত শুন রাজাজী
হাস্তা খেল্যা বেহা হবে বাঁধাবাঁধি কি।
আমরা আনন্দে খাব অন্ন বিছানা বসিয়া
মাগু কোলে কর‍্যা বর ঘরে শুবে গিয়া।

রাজা অন্তরে দুঃখিত হল। জামাইকে বললে, বাছা

সুবর্ণের মন্দিরে আমার কন্যা আছে
তোমাদের বেবস্তা-মত যাহ তার কাছে।

দুখে বাসর ঘরে ঢুকে কন্যার রূপ দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

ইন্দ্রের কামিনী জিনি দেখি তনুবেশ
মুটিত্তে কাঁকালি লুকায় পিটে ভাঙ্গে কেশ।
বিনোদ-বন্ধান হার গাঁথ্যা দিছে গলে
মাথার মানিক কন্যার ধিকি ধিকি জ্বলে।

দুখের মনে হল যেন সাক্ষাৎ মা মঙ্গলচণ্ডী। সে বারবার গড় করে আর বলে

মহামাই চণ্ডী ঠাকুরাণী তোমাকে বুঝাই
আজি যদি বাঁচি মাগো কালি ঘরে যাই।
আজি যদি বাঁচি মাগো কালি যাই ঘরে
অর্বল ছাগল মহিষ বলি দিব তোরে।

শুনে রাজকন্যা হাসি চাপতে পারে না, ভাবলে, "বুঝিনু খামিদ আমার নিশ্চয় পাগল"। কন্যার হাসি শুনে দুখের ভয় বেড়ে গেল। সে ঘরের চাল থেকে ঘোড়ার ঘাস নিয়ে এক কোণে বিছিয়ে তার উপরে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিলে। সকালে রাজকন্যা কেঁদে মায়ের কাছে জামাইয়ের আচরণ বর্ণনা করলে। রানী রাজাকে বললে

কেমন তোমার জামাই শুন নৃপবর
ঝিকে নাকি গড় করে হাজার হাজার।

রাজা রেগে হুকুম দিলে, "ঘটক বামুন কোথা বাঁধে আন গিয়া"। আসতেই রাজা বললে, জামাই অন্ন না খেয়ে কেঁদেছিল কেন? বামুন বললেন, ব্যঞ্জন মুখে দেয় কি, "ঝালে নুনে তোমরা করেছ যবক্ষার", আর কান্নার কথা বলছ?

বনে বনে হৈল বেহা শুন মোর ঠাত্রি
ঘরে তার বাপ-মা খপর পায় নাত্রি।
সাতে যে বৈরাত আল শুন মন দিয়া
ফিকির করিয়া ত্তাকে দিলে ভাগাইয়া।
লোক-কুটুম্ব কেহ না পাইল সমাচার
একারণে কেঁদেছিল হইয়া জারজার।

তখন রাজা বললে, আমার কন্যাকে সে প্রণাম করছিল কেন? বামুন বললেন, তুমি তো বেশ বল, "পরের মনের কথা আমি কেমনে জানি"?

আমারে বিদায় দেহ ঈশ্বরের মুখ চায়্যা।
তোমার জামাঞ্যার তরে ডেকে আন যায়্যা।

মানিক দুখের জবানে ভর করলেন। সুতরাং

যেই কথা কওান পীর সেই কথা কয়ে
রাজার দরবারে আর দুখ্যার নাহি ভয়ে।

শ্বশুরের প্রশ্নের উত্তরে দুখে বললে

শোবার তরে এমন জায়গা দিয়াছিল মোকে
বেটার হইয়া গড় কর্যাছিলাম তাকে।

তার পরে সে নিজের ঐশ্বর্যের গর্ব করলে। রাজা দেখতে চাইলে। জামাই বললে, পাঁচ দিন পরে যেও দেখতে পাবে। রাজা বললে, পাঁচ দিন এখানেই থাক, এক সঙ্গে যাব। মানিক দুখের জবান ছেড়ে আপন মূর্তি ধরলেন। দুঃখে মনে মনে কাঁদতে লাগল, "তালপাতার ঘর সভে ভরসা আমার"। মানিক বললেন, বড়াই করতে গেলে কেন। দুখে বললে, তুমিই তো ঝকমারি করলে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, তুমি যদি আমার মান না রাখ তবে তোমার "সোনার খড়ম দুটি খাইব বেচিয়া", আর শুধু তাই নয়,

যেখানে লাগালি পাব শুনহ ফকীর
মারিয়া লবদা তুড়্যে দিব নাড়া শির।

মানিক বললেন, আমি এগোই সব ব্যবস্থা করতে। দুখে বললে, আমাকে ফেলে রেখে পালাবার ফিকির করছ। মানিক বললেন, "পালাইয়া যাই যদি দোহাই আল্লার"। পীর গিয়ে দুখের তালপাতার কুড়ের চারদিকে সোনার বাড়িঘর তুলে দিলেন, শ্বশুর-বাড়ি থেকে ঘর পর্যন্ত সোনার জাঙ্গাল বাঁধিয়ে দিলেন। গ্রামের নাম রাখলেন কাঞ্চনগর। অলি বললেন, ব্যবস্থা তো সব হ'ল এখন রাজার দলবলের সিপাহি-সামন্তের পরিচর্যা করবে কে?

আসিবে রাজার দল শুন হকিকত
কাখে পাঠাইবে তখন করিতে খেজমত।
কে দিবে তবাক-হুকা শুন হে দেওান
কে শয্যা দিবে তাঁকে বসিতে বিছান।

মানিক বললেন, "উনকোটি ব্যাধি আমার মাঙ্গাইয়া আন"। উনকোটি ব্যাধি এসে মানিক-পীরকে কুর্নিশ করলে।

মানিক বলে জরাস্থর বাত বলি তোরে
তুমি গিয়া দেহ বার তক্তের উপরে।
ধমকা চমকা তোমার প্রকার জানি
দুইজন হও গিয়া দুয়ারের দরওানি।
চক্ষুশূল বুকশূল হও কোতওাল
টঙ্কার ঝঙ্কার দুহে পাড়িয়া জঙ্গাল।
পশ্চিমা মউর আর চোরাবাত অর্বল
পেয়াদা সকল হয়্যা ঘেরহ মহল।
উনকোটি ব্যাধি তারা হুকুম পাইয়া
যে যার রহিল গিয়া জায়গা বুঝিয়া।
এইরূপে তামাম পেয়াদার কারবার
বসিয়া রহিল চৌকি সাত দেউড়ীর উপর।
গাঞ্জাপুর করি কেহ সিদ্ধি ঘুটে খায়।
কেহ বা হাসিয়া লুটে পড়ে কার গায়।
মোজে মোজে বসিয়া কেহ ঢোলক বাজায়
কৌতুক রূপেতে কেহ গীতনাট গায়।

দুখের কুঁড়ে যার চারিদিকে সোনার শহর গড়ে উঠল সেটি হল পীরের খাস আস্তানা। "সেই তালপাতার ঘরে পীর সিদ্ধি ঘুটে খায়"।

পাঁচদিন কেটে গেলে রাজা জামাইকে বললেন, চল তোমার বাড়ীতে নয় লাখ কুকুর দেখিগে, জামা কাপড় পরে নাও, ঘোড়া-ঘরে গিয়ে ঘোড়া বেছে নাও। দুখে পরলে আটপৌরে মোটা কাপড়, বেছে নিলে বুড়ো ঘোড়া। কিন্তু ঘোড়ায় চড়া কঠিন ব্যাপার হল। কোনরকমে লেজে লাগাম লাগিয়ে চড়ে বসল উলটো মুখে। সিপাইরা তো হেসে খুন। খবর পেয়ে রাজা চাইলেন এ দৃশ্য দেখতে। অন্তর্যামী পীর বুঝলেন যে রাজা এ দৃশ্য দেখলে দুখের পক্ষে মুশকিল হবে। অমনি

লেজের দিগে মুখ হইল মানিকের বরে
মুখেতে লেকাম দেখে রাজা আপন নজরে।

সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাদ্যভাণ্ড করে রাজা এলেন জামাইয়ের বাড়িতে। হরজ অলি এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা করতে।

ক্ষেত্রি-কুলেতে কেবল জনম তাহার
নবীনবয়েস যেন ষোড়শ্যা কুঙার।
ললাটে চন্দনচাঁদ পরম উজ্জল
গগনমণ্ডলে যেন শশী টলমল।
খাঁড়া-ধার বাঁশি তার নাসিকার গঠনে
বিজলি ছটকে যেন মুখের দশনে।
কর্ণমূলে বীরবৌলি তাকে ভাল সাজে
রতন-নপুর দুটি চরণেতে বাজে।

ব্যাধিরা রাজার দলবলের খেজমত করতে লাগল।

তোয়্যার তবাক-হুকা কিয়া মেরমানি
বসিতে বিছান দিল পা ধোউতে পানি।
ভাঙ্গিয়া পানের খিলি সভারে জোগায়
পাঙ্খা হাত্যে করি কেহ বাতাস করে গায়।
অগৌর চন্নন সব পুরি হেম-থালে
গলায় পুষ্পের মালা চন্নন কপালে।

আদর-অভ্যর্থনায় পরিতৃপ্ত হয়ে রাজা জামাইকে বললে, বেহাই কোথা আছেন দেখি চল, তাঁকে গড় করে আসি। এই কথা শুনে

দুখিয়া বলেন শ্বশুর শুন মোর ঠাঞি
ভাঙ্গি পুস্তি বুড়া মনুষ্যার কাছে গিয়া কাজ নাঞি।
স্বর্ণের বাড়িঘর না লয় তার মনে
নিরবধি থাকে তালপাতার ভুবনে।

রাজা নিষেধ শুনলে না। তালপাতার ঘর রাজার আসবার আগেই স্বর্ণমন্দিরে পরিণত হল। মন্দিরে ঢুকে রাজা দেখে

সোনার পইতা গলে দিয়াছেন দেওান
লক্ষ্মী সরস্বতী কাছে সালগেরামের স্থান।
কীর্ত্ত্যা কীর্ত্তন করে ভায়্যাগণ নাচে
তুলসীমঞ্চ জে শিবের মটের কাছে।

তফাৎ থেকে রাজা কুর্নিশ করলে। "জীতে রহ" বলে পীর আশীর্বাদ করলেন। পরক্ষণেই বেজার হয়ে দু-চার ঘুঁসি মেরে বললেন, তুই কে, কি নাম, কোথায় বাড়ি, কেন অন্দরে ঢুকেছিস? বীরসিংহ বললেন, আমি তোমার বেহাই, মার কেন। তখন পীর খুশি হয়ে সকলকে ভোজনে বসালেন।

জোড় করি দুই কর মানিক জিন্দা করে পস্থান
বিদুরের খুদকুঁড়া করহ ভোজন।

খাওয়া শেষ হলে পান দেওয়া হল। হরজ অলি রাজাকে ও তার দলবলকে মানিকের হুকুমে যথাযোগ্য ইনাম দিলেন। রাজাও জামাইকে অর্দ্ধেক পরগনা লিখে দিলে। বিদায়ের পূর্বে

মানিক কহেন কথা বেহায়ের সাতে
দুখ্যাকে সঁপিয়া দিল বীরসিংহের হাতে।
আমি দৈবে বুড়া লোক কবে মর্য্যে যাই
তোমার জামাঞ্যার তরে নাম করিহ বেহাই।

সকলে চলে গেলে মানিক দুখেকে বললেন, অনেক কষ্ট করে তোর বিয়ে দিলুম বীরসিংহের ঘরে,

এখন সোনার খড়ম দুটি আনে দেহ মোরে
তোকে দুয়া কর্য্যা যাই হজ মক্কা-শহরে।

দুখে শক্ত লোক, বল্লে, হায় হায়, "যে সাদ করেচ মনে সেটি হবার নয়",

সাড়ে তিনটি বেটা আগে হউক মোর ঘরে
সোনার খড়ম তখন দিব সাহেবেরে।

মানিক হেসে বললেন

বাইশ লক্ষ পরগনার হইল রাজতি
তবু নাঞি ছাড় বেটা রাখালিয়া মতি।

পীর মক্কায় চলে গেলেন। পীরের নামে দুখে ভালো রকম শির্নি দিলে,

খাসি বকিরি দুম্বা হালওান খীর
বাইশ মন দুগ্ধ নিঞা করিল হাজির।
খানাপানি খায়্যা সভে চলিল ভুবনে
মানিকের গীত যে রহিল এইখানে।...

মক্কার রহীমকে অযোধ্যার রাম বলে স্বীকার করে বহু হিন্দু কবি সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর পাঁচালী লিখেছিল। মুসলমানের লেখা পাঁচালীও দু-একটি পেয়েছি। তার মধ্যে যেটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সেটির কাহিনী রামেশ্বর ভট্টাচার্যের প্রসিদ্ধ রচনার সঙ্গে অভিন্ন। কবির নাম ফৈজুল্লা। তিনিও ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ের লোক। এঁর পাঁচালী, 'সত্যপীরের পুস্তক', লেখা হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান দু সম্প্রদায়েরই জন্যে। তাই উপক্রমে মুসলমানের ও হিন্দুর উপাস্য সমানভাবে বন্দিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্মে ও সংস্কৃতিতে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান যে কতটা এক হয়ে এসেছিল তার মূল্যবান্ প্রমাণ পাচ্ছি ফৈজুল্লার কাব্যের এই বন্দনায়।

সেলাম করিব আগে পীর নিরাঞ্জন
মহাম্মদ মস্তফা বন্দো আর পঞ্জাতন।
সের আলি ফতেমা বন্দো একিদা করিয়া
হাচেন হোছেন পেয়দা হৈল যাহার লাগিয়া।
রছুলের চারি ইয়ার বন্দো শত শত
চারি দহ ইমামের নাম লব কত।
এবরাহি খলিলের পায়ে করি নিবেদন
বেটারে করবানি দিল দীনের কারণ।
করবানি করিয়া দিল এসমাল করিয়া
সেই হৈতে নিকে বিভা হইল দুনিয়া।
আম্বিয়ার হাসিল বন্দো পালআন দুইজনে
এসমাইল গাজি বন্দো গড়-মান্দারনে।
বন্দিব…জেন্দা পীর কামাএর কুনি
বড়-খান মুরিদ মিঞা করিল আপনি।
পাঁড়ুয়ার সাফি-খাঁয়ে করি নিবেদন
অবশেষে বন্দিব সত্যপীরের চরণ।
সম্বল জাহানে বন্দিব পীর আছে যত
এক লাখ আশি হাজার পীরের নাম লব কত।
সম্বল পীরিনী বন্দো বিবিগণ যত
বিবি ফতেমার কদমে বন্দিব শত শত।

হিন্দুর ঠাকুরগণে করি প্রণিপাত
খানাকুলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ।
নামেতে বন্দিয়া গাইব ধর্ম নিরাঞ্জন
যার ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন।
যমুনার তটে বন্দো রাম-বৃন্দাবন
কৃষ্ণ-বলরাম বন্দো শ্রীনন্দের নন্দন।
নবদ্বীপে ঠাকুর বন্দো চৈতন্য-গোসাঞি
শচীর উদরে জন্ম বৈষ্ণব-গোসাঞি।
কামারহাটির পঞ্চাননে করি নিবেদন
দশরথের পুত্র বন্দো শ্রীরামলক্ষ্মণ।
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দো গঙ্গা-ভাগীরথী
সীতা ঠাকুরাণী বন্দো আর যত সতী।
দৈবকী রোহিণী বন্দো শচী ঠাকুরাণী
যার গর্ভে গোরাচাঁদ জন্মিল আপনি।
শুনহ ভকত লোক হএ একচিত
সত্যপীর সাহেব সভার করে হিত।…
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ
শুন গাজি আপনি আসরে দেহ মন।
ভকত নাএকের তরে মোকেদ হইয়া
আসিয়া দেখহ পীর আসরে বসিয়া।
ছাড় গাজি মক্কার স্থান আসরে দেহ মন
গাইল ফৈজল্যা কবি সত্য-পদে মন।

সত্যপীরের পাঁচালীর মধ্যে বৃহত্তম ও বিচিত্রতম উত্তরবঙ্গের কৃষ্ণহরি দাসের রচনা। কবি হিন্দু। তাঁর গুরু ছিলেন তাহের মামুদ সরকার।

তাহের মামুদ গুরু শমস-নন্দন
তাহার সেবক হয়ে কৃষ্ণহরি গান।

কৃষ্ণহরি দাসের গ্রন্থে সত্যপীর ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে উপস্থাপিত হয়েছেন। মালঞ্চার রাজা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ময়দানবের অবিবাহিত কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে সত্যপীরের জন্ম হয়েছিল। শঙ্কর-আচার্যের পাঁচালীতেও সত্যপীরের ইতিহাস অনেকটা এইরকম, সেখানে তিনি আলা বাদশাহের কানীন দৌহিত্র। শঙ্কর-আচার্য্যের গ্রন্থ লেখা হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, কৃষ্ণহরির বই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে॥

১০

আঠারো-ভাটির পাঁচালী

হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনীকে মুসলমান পীর-পীরানীর মাহাত্ম্য-কাহিনীতে ঢালাই করবার প্রচেষ্টা প্রকট হল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে। ইতিমধ্যে একাধিক লৌকিক দেবদেবী— যাঁদের মাহাত্ম্য জনসাধারণ অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করে এসেছে তাঁদের প্রতিরূপ মুসলমান জনগণের মধ্যে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু হয়েছে। ফকীর মোহম্মদের মানিক-পীরের গানে দেখেছি যে মানিক-পীর সময়ে সময়ে যেন শিবেরই ছদ্মবেশ। মৎস্যেন্দ্রনাথের ইসলামি প্রতিরূপ হল পীর মছন্দলি (পূর্ব্ববঙ্গে মোচরা পীর,—'মৎস্যন্দ্ধ'রি' হইতে) দেবী মঙ্গলচণ্ডী (বা বনদুর্গা) হলেন বন-বিবি। পশ্চিমবঙ্গে বন-বিবির তলা এখনো পূজা পায়। কোথাও কোথাও পীর হয়েছেন হিন্দু দেবতার প্রতিপক্ষ। যেমন সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণরায়ের প্রতিপক্ষ বড়-খাঁ গাজী। কোন কোন দেবতা দু-সম্প্রদায়ের ভাগে সমানভাবে পড়েছেন। যেমন হিন্দুর কুম্ভীর-দেবতা কালুরায় ও মুসলমানের মগর-পীর কালু শাহা। ক্বচিৎ হিন্দুর ঠাকুর সম্পূর্ণরূপে মুসলমান পীর হয়ে গেছেন কিন্তু নাম বদলান নি। যেমন বৰ্দ্ধমান ও চব্বিশপরগনা জেলায় পীর গোরাচাঁদ।

এই সব নবীন দেবতার মাহাত্ম্য-পাঁচালী রচনা করতে লাগলেন মুসলমান কবিরা জনসাধারণের ধর্মপিপাসা ও কাব্যজিজ্ঞাসা একসঙ্গে মেটাবার জন্যে। এ ধরণের রচনার সাহিত্যিক মূল্য যদি কিছু থাকে তা সাহিত্যের কিমাশ্চর্য্যম্ হিসেবেই। তবে বাংলা সংস্কৃতির একটা বিশেষ পরিণতির নিদর্শন বলে এগুলির ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে। কয়েকটি বিশিষ্ট রচনার সংক্ষিপ্তসার দিচ্ছি। তাতে ইসলামি বাংলা সাহিত্যের এই অজ্ঞাতপূর্ব নব-পৌরাণিক ধারার পরিচয় মিলবে।

বন-বিবির 'জহুরা-নামা' বা মাহাত্ম্য-পাঁচালী লিখেছিলেন অন্তত দুজন কবি, বয়নুদ্দীন ও মোহম্মদ খাতের। কিন্তু দুজনের রচনায় বিশেষ কিছু মৌলিক পার্থক্য নেই। উপক্রমে খাতের গ্রন্থরচনায় এই কারণ দেখিয়েছেন

পূর্ব্বদেশ বাদাবন সেথা হইতে লোকজন
আইসে যারা কেতাব লইতে
হামেসা খায়েস রাখে জেদ কোরে কহে মোকে
এই পুথি রচনা করিতে।
কহে সকলেতে ইহা বন-বিবির কেচ্ছা যাহা
বিরচিয়া ছাপ যদি ভাই
সে হইলে দেশে দেশে পুথি মোরা অনায়াসে
সকলেতে ঘরে বৈসে পাই।
শুনিয়া এয়ছা কথা দেলেতে পাইয়া ব্যথা
ভেবে গুণে আখেরে তখন
বন-বিবির কেচ্ছা যাহা আওয়াল-আখের তাহা
একে একে কৈনু বিরচন।

মক্কা শহরে এক "আল্লার ফকীর" ছিলেন বেরাহিম নামে। তাঁর স্ত্রীর নাম ফুল-বিবি। নিঃসন্তান দম্পতী নিত্যই আল্লার দর্গায় আর রসুলের গোরে প্রার্থনা জানায় সন্তানলাভের জন্যে। তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে হজরত নবী দৈববাণী দিলেন

মেহেরবান তেরা পরে আছে পাক সাই
ফুল-বিবির পেটে কিন্তু ছেলে হবে নাই।
দোছরা করিলে সাদী জানিবেক খাটি
তাহার উদরে পয়দা হবে বেটা বেটি।

ফুল-বিবি স্বামীকে বিয়ে করতে অনুমতি দিলে একটি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে।

বেরাহিম কহে বিবি করিনু কারার
চাবে যাহা কারার পুরা করিব তোমার।

ফকীর শাহা-জলিলের চৌদ্দ-বছর বয়সী কন্যা গোলাল-বিবিকে বেরাহিম বিয়ে করে নিয়ে এল। কিছুদিন পরে গোলাল-বিবির গর্ভ হল।

বন-বিবি শা-জঙ্গলি আছিল বেহেস্তে
হুকুম করিল আল্লা দোহার তরেতে।
গোলাল নামেতে বিবি বেরাহিম-ঘরে
পয়দা হও দোহে গিয়া তাহার উদরে।

ফুল-বিবির মনে ঈর্ষা জাগল। গর্ভ দশ মাসের হলে ফুল-বিবি দাবী জানালে প্রতিজ্ঞা পূরণের। বেরাহিম বললে, কি করব বল। ফুল-বিবি বললে, "গোলাল বিবিকে তুমি দেহ বনবাস"। বেরাহিমের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সে অনুনয় করতে লাগল

একে ত অবলা তাহে হামেলদার আছে
কেমনে তাহাকে রেখে আসি বন বিচে।
এ বাতে এলাহি আল্লা হবেন বেজার
আখেরে দর্গাতে বড় হব গোনাগার।
দূর কর এই বাত মাফ কর মুঝে
ইহা ছেওয়া যাহা চাহ দিব আমি তুঝে।

ফুল-বিবি কোন ওজর শুনলে না। অগত্যা বেরাহিম

গলে ধরে কেন্দে বলে গোলালের ওয়াস্তে
হামেলেতে হেথা তেরা খেদমত করিতে।
শাশুড়ী ননদ এয়ছা কেহ বেঁচে নাই
চল তেরা বাপ-ঘরে লিয়া তুঝে যাই।

গোলাল খুসি হয়ে স্বামীর সঙ্গে চলল বাপের বাড়ির উদ্দেশে। কতক দূর গিয়ে বেরাহিম পথ ছেড়ে জঙ্গলের বিপথ ধরলে। গোলাল বললে, এ কোথা চললে। বেরাহিম বললে, জঙ্গলের মধ্যে হজরত আলীর সমাধি আছে, সেখানে

মানত করেছি আমি সাদির সমেতে
হামেল হইলে বিবি আমার ঘরেতে।
বিবি শুদ্ধা আসিয়া যে খোসাল অন্তরে
জিয়ারত করে যাব মোবারক গোরে।

খানিকটা গিয়ে গোলাল ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল এক গাছতলায়। স্নিগ্ধ হাওয়ায় বিবি গেল ঘুমিয়ে। সুযোগ বুঝে সেইখানে তাকে ফেলে রেখে বেরাহিম সরে পড়ল। যাবার আগে তিনবার ধর্মের ডাক দিলে। বিবি ঘুমচ্ছে সুতরাং সাড়া দিতে পারলে না। বেরাহিমের বিবেক শান্ত হল।

বেরাহিম কহে আল্লা দোষ নাহি মোর
বিবিকে ডাকিনু এত না দিল উত্তর।

ইহা বলে বেরাহিম দয়া মায়া ছেড়ে
পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া চলে আইসে ঘরে।

ঘুম ভেঙ্গে উঠে নিষ্ঠুরতা দেখে গোলাল কাতর হয়ে খোদার দর্গায় হাত তুলে আরজ করতে লাগল,

পড়েছি বিপদে বড় হও মেহেরবান
মদদ ভেজিয়া কর মুস্কিল আছান।

আল্লার দয়ায় বেহেস্ত থেকে চার জন হুর এসে বিবিকে পরিচর্যা করতে লাগল। যথাসময়ে প্রসব হল এক মেয়ে ও এক ছেলে। হুরেরা অন্তর্হিত হল। দুটি শিশুকে পালন করা শক্ত ভেবে গোলাল মেয়েটিকে ফেলে রেখে চলে গেল। বনের হরিণী বন-বিবিকে মানুষ করতে লাগল। এই ভাবে সাত বছর কাটল। বেরাহিম ফুল-বিবির উপর বিরক্ত হয়ে গোলাল-বিবিকে খুঁজতে এল বনে। ঘুরে ঘুরে

দেখে এক গাছতলে জঙ্গলিকে লিয়া
বেহালেতে দর্দ-দেলে রহিছে বসিয়া।

বিবির হাত দুটি ধরে বেরাহিম কেঁদে বললে,

যা হবার হইয়াছে চারা নাহি আর
উঠ বিবি চল এবে ঘরে আপনার।

গোলাল অভিমান করে বললে,

হামেলদার আওরতেরে দিয়া বনবাস
এতদিন বাদে আইলে করিতে তল্লাস।

ছেলেটিকে নিয়ে স্বামী স্ত্রী ঘরমুখো হল। পথে ভাইকে দেখতে পেয়ে বন-বিবি পিছু পিছু

হেকে বলে কোথা যাও শা-জঙ্গলি ভাই
মা-বাপের তরে আর প্রয়োজন নাই।
এক সঙ্গে ছিনু মোরা ভাই বহিনেতে
আমাদের জহুরা হবে আঠারো-ভাটিতে।

ভগিনীর আহ্বানে শা-জঙ্গলি সাড়া দিলেন। বাপ-মাকে সান্ত্বনা দিয়ে দুজনে গেলেন মক্কায়। সেখানে

হাসেনের আওলাদ হইতে মুরিদ হইয়া
ফাতেমার গোরে জিয়ারত করে গিয়া।

ফাতেমার গোর থেকে দৈববাণী হল বন বিবির প্রতি আঠারো-ভাটিতে যেতে,

এলাহি আলমিন আল্লা পরোয়ার-দেগার
আলম করিল পয়দা আঠারো হাজার।
তাহা সবাকার দর্দ মা বলে যে ডাকিবে তোমারে
দয়াবান হয়ে তুমি উদ্ধারিবে তারে।

দু-জনে হজরত নবীর গোরে গিয়ে প্রার্থনা করলেন,

ফকীরের গুরু তুমি খেলাফত দিয়া
বিদায় করহ আমা দোহার লাগিয়া।
শুনে নবী দরগাতে আরজ করিল
সেই ঘড়ি খেলকা টুপি আসিয়া পৌছিল।

ভাই-বোনে টুপি খেলকা পরে খুশি হয়ে বেরিয়ে পড়লেন আঠারো-ভাটির উদ্দেশে। তাঁরা হিন্দুস্থানে পৌঁছে গঙ্গা পেরিয়ে ভাঙ্গড়-শার সাক্ষাৎ পেলেন। ভাঙ্গড়-শা বললেন, এইতো আঠারো-ভাটির দেশ,

এখানে দক্ষিণরায় ভাটির ঈশ্বর
নানা শিষ্য কৈল সেই বনের ভিতর।
নুন মোম খাড়ি জড়ি বহুত এয়ছাই
হাট মধু বসায়েছে কত ঠাই ঠাই।
পহেলা যাইয়া তুড়ে ডাল এ সকল
তবে মাগো ভাটি-দেশ হইবে দখল।
রায়মঙ্গল চাঁদখালি শিবাদহে গিয়া
আগে এ সকল ঠাই আমল করিয়া।
তা বাদে জুড়িতে গিয়া করিবে আসন
সেথা হৈতে আগে না বাড়িবে কদাচন।
কিন্তু যেথা চাঁদ আছে চাঁদখালি বিচে
ওয়াকেফ হইবে হাল গিয়া তার কাছে।
আন্ধারমানিক তক তাহার আমল
না যাইবে সেখানেতে করিতে দখল।

শা-জঙ্গলিকে নিয়ে বন-বিবি চললেন বাদা-বন দখল করতে। জুড়িতে পৌছে তাঁরা বসলেন নমাজে। জঙ্গলির আজান-হাঁক রায়মণির (অর্থাৎ দক্ষিণরায়ের)

কানে গেল। তিনি রায় সনাতনকে বললেন, বন্ধু বড়-খানের ডাক বলে তো মনে হচ্ছে না, দেখে এস আর কে ফকীর আমার সরহদ্দে এসে হাঁক পাড়ছে, দাও তাকে তাড়িয়ে।

রায়ের হুকুম পায় সনাতন চলে যায়
দেখে দোহে রয়েছে বসিয়া
ছেরে কালা জুব্বা গলে মুখে আল্লা আল্লা বলে
আসা-ঝাণ্ডা সামনে গাড়িয়া।

সনাতন ভয় পেয়ে রায়ের কাছে ফিরে এসে বললে, "এক মর্দ্দ এক মেয়ে বৈসে দোহে উর্দ্ধ-মুয়ে হাত তুলে আল্লা আল্লা করে"। শুনে দক্ষিণরায় প্রস্তুত হলেন দলবল নিয়ে ভাই-বোনকে ভাগিয়ে দিতে।

হেন কালে নারায়ণী রায়মণির মা-জননী
ঘরে ছিল খবর পাইয়া।
এসে বলে বাছা-ধন লড়িবার প্রয়োজন
নাহি তোর আওরতের সাথে
জিনিলে না লাভ পাবে মরিলে অখ্যাতি হবে
মানে হীন হইবে ভাটিতে।
তুমি থাক আমি যাই হারি জিতি ক্ষতি নাই
আওরত-আওরতে লড়া ভাল
নারায়ণী ইহা বলে দেও-দানা লিয়া চলে
সেনা শিষ্য যত তার ছিল।

প্রথমে যুঝতে এল দানো-ভূত-দেও সৈন্য। ভাইকে সাহস দিয়ে বললে বন-বিবি, "কাফের ভূতের জাতে ভাগাইবে বন হৈতে জোরে তুমি হাঁকহ আজান"। প্রথম আক্রমণে সুবিধা করতে না পেরে নারায়ণী পাঠালেন ডাকিনী-বাহিনী। তারা

যাই যাই বলে হাঁকে যেমন আছমান ডাকে
জুড়ে আইসে আকাশ-পাতালে
বন-বিবি হুঙ্কারিয়া চারি দিকে বেড়া দিয়া
ঘেরে সবে এছমের জালে।

খুস্তি আসা ছিল হাতে ফুক দিয়া ছাড়ে তাতে
ছেড়ে দিল আছমান পানে
যেন বজ্রাঘাতে গেরে ডাকিনী সবার ছেরে
বন-বিবির মহিমার গুণে।

তখন দুজনে হাতাহাতি যুদ্ধে লেগে গেলেন। সারাদিন দ্বন্দ্ব চলল। শেষে বন-বিবি বেকায়দায় পড়ে বরকতের শরণ নিলেন। বরকতের আশীর্বাদে তাঁর গায়ে জোর বাড়ল। নারায়ণী পরাস্ত হলেন এবং বন-বিবিকে সই বলে অনুনয় করতে লাগলেন,

প্রাণদান দেহ মোরে না মার আমার তরে
দাসী হয়ে রহিব তোমার
আঠারো-ভাটির বিচে অধিকার যে যে আছে
সবশুদ্ধা হৈল তাবেদার।

দুজনের ভাব হল। বন-বিবির প্রথম ঘাঁটি দখল হল। তারপর বন-বিবি বেরলেন "জহরা" করতে। প্রথমে পৌছলেন ভুরকুণ্ডে (বর্দ্ধমান-হুগলী সীমান্তে তিরোল গ্রামের কাছে মুড়াই নদীর ধারে)। সেখানে

ছাটি বাদা বসাইতে চলে গায়ে গায়
জঙ্গলি মোকেদ হয় পিছে পিছে ধায়।
দক্ষিণেতে এড়োজোল সরহদ্দ করিয়া
ভবানীপুরেতে বিবি পৌছেন যাইয়া।
বেতাখাল পার হৈয়া রাজপুরে গেল
তার পরে বিরাড়িতে যাইয়া পৌছিল।
সেথা হৈতে গিয়া ফের মাখালগাছায়
করিয়া বাদার সৃষ্টি আসড়িতে যায়।
মায়নাডাঙ্গা মেঅমলানি সৃষ্টি সে করিয়া
হাসনাবাদের বিচে পৌছেন যাইয়া।
তা বাদে পাঠালিগ্রাম কাটাখালি হদ্দ
ছাটি বাদা বসাইয়া করিলা সরহদ্দ।

বিবি ফিরে এলেন ভুরকুণ্ড মোকামে। তাঁর বাদা অধিকারে "মোম মধু বনে পয়দা হইতে লাগিল"।

কেঁদোখালি দিল বিবি দক্ষিণরায়েরে
নাহি যায় সেথানে দখল করিবারে।

বরিজহাটিতে ছিল দু ভাই "মউল্যা" অর্থাৎ মধু-সংগ্রহকারী, নাম ধনাই ও মনাই। চৈত্রমাস মধু-সংগ্রহ করবার সময়। ধনাইয়ের সখ হল নৌকা সাজিয়ে লোকজন নিয়ে মোম মধু সংগ্রহ করতে ভাটিতে মহলে যেতে। সেখানে বাঘের ভয় বলে মনাই নিষেধ করলে, বললে

যত টাকা চাহ লেহ দিব আমি ভাই
তোমার রোজগার আমি কিছু নাহি চাই।

ধনাই নিষেধ মানলে না। তাদের আশ্রিত গরীব রাখালছেলে দুখেকে নিলে সঙ্গে। দুখের মা বুড়ি রাজি ছিল না। ধনাই তাকে কথা দিলে দুখেকে সে বেটার মাফিক দেখবে। সে আরো বললে

মহল হইতে ফিরে ঘরেতে আসিয়া
টাকা দিয়া দুখেরে দেলাব আমি বিয়া।

মহলে গিয়ে ধনাই মধু খুঁজে বেড়াতে লাগল দুখেকে নৌকায় রেখে। খাড়ি থেকে দক্ষিণরায় দেখলেন যে ধনাই-মউলে মহলে এসে তাঁর পূজা-বলিদান কিছুই দিলে না। তিনি স্থির করলেন,

গড়খালি গিয়া বাদি দিব যে উহায়
ছাপাইব মোম-মধু যেন নাহি পায়।
যাবৎ না দেয় মোরে নরবলি-পূজা
নাহি দিব মোম-মধু দেখাইব মজা।

দক্ষিণরায়ের মায়ায় ধনা চাক দেখে এগিয়ে যায় কিন্তু মধু পায় না। তিন দিন বৃথা ভ্রমণের পর সে নৌকায় ফিরে গিয়ে দেবতার প্রত্যাদেশের ভরসায় অনাহারে শুয়ে রইল। দক্ষিণরায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন

দণ্ডবক্ষ[১] মুনি ছিল ভাটির প্রধান
দক্ষিণরায় নাম আমি তাহার সন্তান।…
যদি তুমি নরবলি-পূজা পার দিতে
সাত-ডিঙ্গা মোম দিব তোমার তরেতে।

দুখের উপর রায়ের লোভ বুঝে ধনা দুঃখিত হয়ে বললে দুখেকে দিতে পারব না,

[১] অর্থাৎ 'দাঁড়াবুকো'? নামটি আসলে 'দন্তবক্র'-ও হতে পারে।

তার মা আমাকে হাতে হাতে সঁপে দিয়েছে। রায় বললেন, দুখেকে আমার চাইই। তখন ধনা বাধ্য হয়ে রাজি হল। রায় বললেন, কেঁদোখালি গিয়ে ওকে আমার হাতে দিয়ে ডিঙ্গায় মোম-মধু ভরে নাও। দুখে জেগে ছিল। সে সব কথা শুনতে পেলে। মায়ের কথা স্মরণ করে সে কাঁদতে লাগল।

> ইহা বলে কান্দে দুখে মুখে নাহি রা
> কহে কোথা দেখা দেও বন-বিবি মা।
> বিপদে কাণ্ডারী তুমি শুনিয়াছি কানে
> তোমার স্বপনে মাগো আসিয়াছি বনে।

তখনি বন-বিবি দেখা দিলেন তার শিয়রে মায়ের বেশ ধরে। বললেন

> রায়কে যখন ধনা দেয়াবে তোমারে
> সেই ওক্তে মা বলিয়া ডেকো তুমি মোরে।
> তখনি তোমার কাছে পৌছিব আসিয়া
> রায়মণির হাত হতে লিব উদ্ধারিয়া।

সাত ডিঙা নিয়ে ধনাই এলো কেঁদোখালিতে। রাত্রিতে নৌকায় শুয়ে রইল। দক্ষিণরায় স্বপ্ন দিলেন

> বনেতে যাইয়া মধু ভাঙিবে যখন
> পহেলা আমার নাম করিবে স্মরণ।
> তার পরে দিবে হাত মধুর চাকেতে।
> উড়িয়া তামাম মক্ষি যাইবে তফাতে।

ধনাই তার নৌকা সব ভরতি করলে মধুতে। তা দেখে রায় বললেন, মধু ফেলে দাও,

> মোমের কিম্মত বেশি মধুর থোড়াই
> খালি মোম লেহ ডিঙা করিয়া বোঝাই।

এই কথা শুনে মধু সব ফেলে দিয়ে ধনা ডিঙা ভরলে মোমে। সেই থেকে সেই জায়গার নাম হল মধুখালি।

> আজ তক সেগাঙ্গের পানি মধু-পানা
> চার তরফেতে আর পানি সব নোনা।

রাত্রিবেলায় খাওয়া দাওয়া শেষ হলে কাঠ আনতে দুখেকে কুলে নামিয়ে দিয়ে ধনা

নৌকা খুলে দিলে। কাঠ সংগ্রহ করে ফিরে এসে দুখে দেখলে যে নৌকা একটিও নেই। তখন

> বিপাকে পড়িয়া দুখে কান্দে উভরায়
> খাড়ি থেকে রায়মণি দেখিবারে পায়।
> হইয়া রাক্ষস বেটা বাঘের আকার
> চলিল দুখের তরে করিতে আহার।
> বিষম দুরন্ত বাঘ আসে গাল মেলে
> দুখে দেখে মা বলিয়া গিরে ভূমিতলে।

ভুরকুণ্ড মোকামে বন-বিবির কানে পৌছল এই ডাক। ভাই-বোন দৌড়ে এলেন, দেখলেন দুখে পড়ে আছে বেহুশ বেহাল হয়ে। শা-জঙ্গলি তার চেতন করালেন। তারপর দক্ষিণরায়ের দিকে চোক পাকিয়ে বিবি

> জঙ্গলিরে কহে ভাই শুন দেল দিয়া
> কাফের রাক্ষস বেটা আছে দাঁড়াইয়া।
> ধরিয়া গোরুর গোস্ত খাওয়াও উহায়
> খাইতে এসেছে যেয়ছা আমার বেটায়।

শা-জঙ্গলির সঙ্গে দক্ষিণরায়ের লড়াই বাধল। হেরে গিয়ে রায় পালালেন। সামনে পড়ল অগম দরিয়া। নিজের মহিমায় রায় নদী পেরিয়ে গেলেন। জঙ্গলি আল্লার নাম নিয়ে দরিয়ায় পড়লেন ঝাঁপিয়ে।

> এলাহির ভেজা শাহা কামায়ের ধনী
> আগম দরিয়ায় হৈল আধা-হাঁটু পানি।

রায় তখন হাঙ্গর-কুমীরদের আদেশ করলেন জঙ্গলিকে গ্রাস করতে। পা ঝাড়া দিয়ে হাঙ্গর-কুমীর সব সাবাড় করে শা-জঙ্গলি কিনারায় উঠলেন।

> দেখে রায় পেয়ে ভয় সেথা হৈতে ছুটে
> হাজির হইল এসে গাজীর নিকটে।

সব কথা শুনে রায়ের বন্ধু বড়-খাঁ গাজী বললেন, করেছ কি,

> কামায়ের ধনী বিবি বড় নেক-তন
> তাদের উপরে সথা পাক নিরাঞ্জন।

দক্ষিণরায় ভয় পেয়ে গাজীর গা ঘেঁষে বসে রইলেন। শা-জঙ্গলি সেখানে

আসতেই গাজী উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বললেন, "কাহে এত গোস্বা-দেব কহত আমারে"। জঙ্গলি গরম-মেজাজে অভিযোগ করলেন

ইছলাম হইয়া নাহি ডর পাকজাতে
কাফেরের সাথে তুম্মি বৈস এক সাথে।

গাজী বললেন, "এই যে বামন ইনি বন্ধু মোর হয়"। জঙ্গলি বললেন রায়কে, "বন-বিবি ডাকিয়াছে চলহ ত্বরায়"। রায় যেতে চান না। গাজী তাঁকে সাহস দিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বিবি গাজীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে

গাজী বলে বড়-খান নাম যে আমার
আমার বাপের নাম শাহা সেকেন্দার।
মেহেরবানি করিয়া হজরত নবী আপে
সুলতানের শাহি দিয়াছিল মেরা বাপে
জায়গীর পাইয়া আমি আসি ভাটীশ্বরে
চিনিয়া না চিন বিবি তুমি মোর তরে।

বিবি গোঁসা-ভরে বললেন

তুমি যদি অলি আল্লার আছ এখানেতে
তবে কেন মানুষেরে খায় রাক্ষসেতে।
আউলিয়া করিয়া তুঝে পাঠাইল সাঁই
করিবে হামেশা তুমি বান্দার ভালাই।
তাহা না করিয়া মিলে ভূতের সঙ্গেতে
মারহ মানুষ গোরু বনের বিচেতে।

গাজী উত্তর দিলেন, মা হয়ে ছেলেকে ভূত বলে গালি দিও না,

বুঝে দেখ এ বাতে রহিয়া যাবে খোঁটা
ভূত বল যার তরে সে তোমার বেটা।

বিবি বললেন, "কেমনে দক্ষিণরায় বেটা মোর হয়"? গাজী বললেন, নারায়ণী যুদ্ধে হেরে তোমাকে সই বলেছিল, সুতরাং

বিচার করিয়া দেখ মনে আপনার
রায়মণি সই-বেটা হইল তোমার।

বিবি লজ্জিত হয়ে মাথা হেঁট করলেন। দিলের গোঁসা দূর করে দিয়ে বন-বিবি বললেন

দিলের বিচেতে আমি বুঝিনু এখন
এক বেটা ছিল দুখে হৈল তিন জন।

দুখে গাজী ও রায় তিন জনে ভাই বলে পরস্পর কোলাকুলি করলেন। বিবি মর্দ দুজনকে বললেন,

দুখে যদি ছোট ভাই হইল তোমার
কি দিবে ইহাকে কহ সামনে আমার।

গাজী বললেন, "সাত জাড়ি ধন আমি দিব যে উহারে"। রায় বললেন, আঠারো-ভাটির মধ্যে মোম আর মধুর অধিকার একে দিলুম। গাজী ও রায় বিদায় নিলে পরে বন-বিবি দুখেকে কোলে নিয়ে

আঠারো-ভাটিতে ফেরে ভ্রমণ করিয়া
বন বাদা খাড়ি আদি সব দেখাইয়া।
ভুরকুণ্ড মোকামে এসে আপনার স্থানে
খোসালিত হয়ে বিবি বৈসেন আসনে।
ঘুচিল দুখের দুঃখ বিবির কৃপাতে
রহে দুখে দস্ত-জোড়া হাজির খেদমতে।

এদিকে ধনাই দেশে ফিরে প্রচার করে দিলে যে দুখে কাঠ আনতে গিয়েছিল, তাকে বাঘে খেয়েছে। দুখের মা শুনে কেঁদে বেড়াতে লাগল। তাঁর ব্যাকুল ক্রন্দনে বন-বিবির টনক নড়ল। তিনি দুখেকে সেকো কুমীরের পিঠে চড়িয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন এই সান্ত্বনা ও নির্দেশ দিয়ে,

পড়িলে মুস্কিল দায় ডেকো তুমি সে সময়
মা বলিয়া আমার কারণ
সেতাবি যাইয়া তোরে লইব উদ্ধার করে
নাহিক ভুলিব কদাচন।
যদি না ডাকিলে যাই জঙ্গলির শির খাই
নেহাত কহিনু তেরা আগে।
আর এক কথা শুন বাড়িতে যাইয়া যেন
ধনার সঙ্গেতে অনুরাগে।
ঝগড়া ফেছাদ করে গালি নাহি দিও তারে
ঝগড়াতে নাহি প্রয়োজন

তার অছিলাতে আইলে তাই যে আমারে পাইলে
নহে কি পাইতে দরশন।
যেয়ছা সে কারার পরে এনেছিল তোর তরে
এখন উচিত এই তার
ঘরে গিয়া বাছা-ধন হয়ে খোসালিত মন
সাদি কর বেটিকে তাহার।

গ্রামের ঘাটে পৌছে বিদায় নেবার আগে দুখে "সালাম তছলিম করে কুম্ভীরের পায়"। ঘরে এসে সে দেখে তার মা শোকে কান্না-কাল্লা হয়ে মরার মত শুয়ে আছে। তার ডাকে মা সাড়া দেয় না দেখে দুখে বন-বিবিকে স্মরণ করলে। অমনি বিবি

শ্বেত মাক্ষি হৈয়া বৈসে দুখের কানেতে
কহে বাছা কেন ডাক আমার তরেতে।

বন-বিবির দয়ায় দুখের মা সুস্থ হয়ে উঠে বসল। তারপর ছেলের কাছে বন-বিবির দয়ার কথা শুনলে। শুনে

বুড়ি বলে বাছা তুমি যাহার কৃপাতে
প্রাণ দান পেয়ে বেঁচে আইলে ঘরেতে।
গলায় কুড়ালি বেন্ধে মেঙ্গে সাত গাঁয়
হাজত খয়রাত তার করহ ত্বরায়।

দুখে তাই করলে। গ্রামের ছেলেদের ডেকে এনে বন-বিবির নামে ক্ষীর খয়রাত করলে। এইভাবে দুখের দ্বারা বন-বিবির পূজা প্রচার হল।

তারপর দুখে বড়-খাঁ গাজীর কথামত সাত-জাড়ি ধন পেলে। বন-বিবির পরামর্শে দুখে যত্ন-রায়কে দেওয়ান বহাল করলে। দুখের বাড়বাড়ন্ত হল। বন-বিবির স্বপ্নাদেশ পেয়ে ধনাই-মউল্যা কন্যা চম্পার বিয়ে দিলে দুখে-শাহার সঙ্গে। উৎসব চুকে গেলে

তার পরে পাকাইয়া ক্ষীর গোস্ত ভাত
বন-বিবির নামে কত করিয়া খয়রাত।
মা মা বলে ডাকে দুখে কাতর হইয়া
শ্বেত মক্ষি হয়ে বিবি পৌছিল আসিয়া।

বরবধূকে দোয়া করে বিবি অন্তর্হিত হলেন। দেশের চৌধুরী হয়ে দুখে সুখে কাল কাটাতে লাগল।

বন-বিবির পাঁচালী গাথা হয়েছে সুন্দরবনের "মউল্যা" অর্থাৎ মধু-মোম-সংগ্রাহকদের বিশিষ্ট অধিদেবতাকে উপলক্ষ্য করে। হিন্দু ব্যাধ-কাঠুরে-পশুপালকের অধিদেবতা বন-দুর্গার বা মঙ্গল-চণ্ডীর রূপান্তর ইনি। পূর্বতন দক্ষিণ রায়, বড়-খাঁ গাজী ও কালু-শাহার বিরোধকাহিনীর অনুবৃত্তি পাই বন-বিবির উপাখ্যানে। অষ্ট্রিক-মোঙ্গল জাতির অন্যতম উপাস্য ব্যাঘ্রমানব অপদেবতা কাল-ক্রমে দক্ষিণবঙ্গের জাঙ্গল-অনূপ প্রান্তে দক্ষিণরায় ঠাকুরে পরিণত হলেন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বড়-খাঁ গাজী হলেন দক্ষিণের অধীশ্বর। দক্ষিণপশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির বিরোধমিলনের একটু ইতিহাস রয়ে গেছে দক্ষিণরায় বড়-খাঁ গাজীর গল্পের মধ্যে। হিন্দু কবির লেখা কাহিনীর বিশিষ্ট নাম 'রায়মঙ্গল', মুসলমান কবির লেখা সাধারণত 'গাজী সাহেবের গান' নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দু কবির লেখায় দুটি নায়কের মধ্যে কারো মাহাত্ম্য খর্ব করা হয়নি। মুসলমান লেখক কিন্তু দক্ষিণরায়ের হীন পরাভব দেখিয়ে তবে দু দেবতার মধ্যে দোস্তানি পাতিয়েছেন।

আবদুল গফুরের 'গাজী সাহেবের গান'-এর বা 'কালু-গাজী-চম্পাবতী পাঁচালী'-র একটু বিস্তৃত পরিচয় দিচ্ছি। পুরানো পাঁচালী কাব্যের রীতি অনুসারে প্রথমে বন্দনা-পালা। কবির নতি পেয়েছেন কালু-শাহা, বড়-খাঁ গাজী, ত্রিবেণীর দাফর-খাঁ, গোরাচাঁদ পীর, একদিল সাহেব, ছোট-খাঁ ও বড়-খাঁ, পাঁড়ুয়ার শাহা সফি, বদর সাহেব এবং সত্যপীর। তারপর কেচ্ছা শুরু। বিরাট-নগরের রাজা শাহা সেকান্দরের পুত্র জুলহাস (বা জুল-শাহা) শিকারে গিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হল, অর্থাৎ সুড়ঙ্গপথে পাতালে গিয়ে সেখানের রাজকন্যা পাঁচতুলাকে বিয়ে করে রয়ে গেল। পুত্রহারা রানী সমুদ্রে ভেসে আসা মঞ্জুষার মধ্যে একটি শিশুকে পেয়ে ছেলের মত মানুষ করতে থাকে। এই ছেলে কালু (বা কালু-শাহা)। কিছুকাল পরে রানীর ছেলে হল। এই ছেলেই বড়-খাঁ গাজী। দু-ভাই কালু-গাজীর মন শৈশবেই ধর্মপ্রবণ হচ্ছে দেখে রাজার চিন্তা হল। গাজীর বয়স যখন দশ বছর হল তখন রাজা তাকে রাজকার্য্য দেখতে অনুরোধ করলে। গাজী বললেন সিংহাসনে আমার কাজ নেই। রাজা পুত্রের উপর নির্যাতন শুরু করলেন, যেমন করেছিল হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের উপর। শেষ পরীক্ষায় গাজী গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত সূচ উদ্ধার করলেন আল্লার দয়ায়, খোওাজ খিজির ও গঙ্গাদেবীর সাহায্যে। তখন সেকেন্দর-শাহা পুত্রের অতিলৌকিক মাহাত্ম্য উপলব্ধি করলে।

পিতার আচরণে পুত্রের মনে অকাল বৈরাগ্য এনে দিলে। একদা নিশীথে... মায়ের কোল ছেড়ে গাজী বেরিয়ে পড়লেন ফকীর সেজে বৃহৎ সংসারের খাতিরে। জানতে পেরে কালু তার সঙ্গ নিলেন এই বলে, "ঝুলি কান্থা বহে আমি যাইব তোমার"। দু-ভাইয়ের পথ এসে ঠেকল সমুদ্রের কিনারে। গাজী আসাবাড়ি ফেলে দিলেন সমুদ্রের জলে। আসা-বাড়ি নৌকা হয়ে দু'জনকে পার করে দিলে। তারপর তাঁরা এলেন সুন্দরবনে। সেখানকার বাঘ-কুমীর-জেন-পরী সব হল গাজীর শিষ্য। গাজীর মাহাত্ম্য এমনি যে

নৌকায় যাইত যবে ডাক বাইত বাঘ সবে
কুম্ভীরেতে কাণ্ডার ধরিত
গঙ্গা দুর্গা শিব গিয়া সকলে করিত দয়া
গাজীর মান্দী সকলে বসিত।

সুন্দরবনে কিছুকাল কেটে গেলে কালু চলিষ্ণুচিত্ত হয়ে একদিন ভাইকে বললেন

ফকীরের রীত নহে থাকা এক ঠাই
হেথা হৈতে চল এবে আর কোথা যাই।

গাজী রাজি হলেন। আবার দুজনে পেরলেন দরিয়া, পৌছলেন সাফাই-নগরের রাজা শ্রীরামের দেশে। লোকালয়ে দর্শন দেবার আগে কালু গাজীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নিলেন যে পথে গাজী কাকেও প্রণাম করবেন না। কিছু দূর গিয়ে দেখা গেল এক গাছতলায় চারজন ফকীর বসে আছেন, খোওাজ খিজির ও তিন পীর। গাজী খিজিরের পায়ে প্রণাম করলেন। কালু রাগ করে বললেন, "কিজন্য সালাম কর চোর বেটা সবে"। দু-ভায়ের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হল। ক্ষুধিত হয়ে দু-ভাই রাজসভায় গিয়ে হাজির হলেন। মুসলমান জেনে রাজা তাঁদের তাড়িয়ে দিলে। শহরের অন্যত্রও আশ্রয় মিলল না। তাঁরা বনে ফিরলেন। আল্লা তাঁদের খাবার পাঠালেন। রাজার অপমান গাজীর চিত্ত স্পর্শ করেনি, কালু কিন্তু তা ভুলতে পারছেন না। তাঁর মনে জাগল প্রতিশোধের বাসনা।

অগ্নি যদি লাগি যায় এ রাজার ঘরে
আর যেন নিয়া যায় রানীরে যে ধরে।
এ রাজার লোক সব জাতি যদি দিত
মনের মানস মোর তবে পূর্ণ হৈত।
যখন একথা মনে কালু-শাহা কৈল
প্রভুর দরগায় দোওা কবুল করিল।

কালুর মনস্কামনা আল্লা মঞ্জুর করলেন। রাজপ্রাসাদে আগুন লাগল। এক জীন রানীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে নদীতীরে বিজন মসজিদের ভিতর বন্দী করে রাখলে। তখন মসজিদে নমাজ করছিলেন খোওাজ খিজির ও তাঁর তিন সঙ্গী। কালু যোগবলে মসজিদের দরজা এঁটে দিলেন। খিজির ও পীরেরা বার হতে পারলেন না। বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে রাজা দৈবজ্ঞের শরণ নিলে তারা কালু-শাহাকে ঠেকিয়ে দিলে। কালু বললেন, আগে মুসলমান হও তবে রানীর খোঁজ দেব। রাজা মুসলমান হল, এবং

পাত্রমিত্র যত তার সকলে আসিয়া
মোসলমান হৈল সবে কলেমা পড়িয়া।
কালু-শাহা নিজ হস্তে ঝুঁটি কাটি নিল
রামনাম ছাড়ি নবীর কলেমা পড়িল।

রাজা ও রাজ্য রক্ষা পেলে। কিন্তু রানী কই। "রানীকে লইয়া গেল লুচ্চা চারিজন"—এই বলে কালু মসজিদের সন্ধান দিলেন। রাজার লোক রানীকে উদ্ধার করলে এবং খোওাজ ও তাঁর সঙ্গীদের চোর মনে করে বেঁধে নিয়ে এল। গাজী তাঁদের খালাস করে দিলেন এবং বুঝলেন এ কালুরই কীর্তি।

রাজসভার আতিথ্যসুখে কিছু কাল কেটে গেলে পর

একদিন কালু-শাহা গাজীরে কহিল
ফকীরের এত সুখ নাহি হয় ভাল।

গাজী বললেন, ঠিক বলেছ। দু-ভাই আবার বেরিয়ে পড়লেন পথে। পৌছলেন এক বনান্তে। তাঁদের সেবা করলে সাত-ভাই কাঠুরে। গাজীর অনুগ্রহে তারা ধনী হয়ে সমুদ্রের উপকূলে নিবাস করলে। গাজীও সেখানে আস্তানা গাড়বার মন করে গঙ্গাকে বললেন টাকাকড়ি জিনিসপত্রের যোগান দিতে। গঙ্গার আদেশে

এসমস্ত চীজ লয়ে সর্প পরে আরোহিয়ে
আইল পদ্মা গাজীর সাক্ষাতে
হাসিয়া প্রণাম করে ভগিনী বলিয়া ধরে
লইল গাজী তুলিয়া কোলেতে।

সেখানে সোনার মসজিদ উঠল। গ্রামের নাম হল সোনাপুর।

পরীদের মেয়েরা মতলব করলে চাম্পাবতীর সঙ্গে গাজীর বিয়ে দিতে।

চাম্পাবতী দক্ষিণ-রাজ্যের রাজা মুকুটরায়ের কন্যা। রানীর নাম লীলাবতী। রাজার বল-বুদ্ধি-ভরসা দক্ষিণরায় ঠাকুর।

দক্ষিণা নামেতে রায় রাজার গোসাঞি
তার সমতুল্য বীর ত্রিভুবনে নাই।

আরব্য-উপন্যাসের কাহিনীর মতই পরীরা নিদ্রিত গাজীকে চাম্পাবতীর মন্দিরে নিয়ে গেল নিশীথে। প্রথমেই চাম্পাবতী আকুল হল গাজীর ভবিষ্যৎ ভেবে। বললে

দক্ষিণা নামেতে রায় গোসাঞি পিতার
যাহার বলেতে লইল তামাম সংসার।
মনিষ্য ধরিয়া সেই আহার করয়
তাহার হস্তেতে সোঁপি দিবেক তোমায়।

গাজী নিজের পরিচয় দিয়ে আশ্বস্ত করতে গেলে হিতে বিপরীত হল। গাজীকে মুসলমান জেনে চাম্পাবতী খুব রেগে গেল। গাজী দিলেন অদৃষ্টের দোহাই। চাম্পাবতী খড়ি পেতে গুণে দেখলে যে গাজীর কথাই ঠিক, তার কপালে আছে মুসলমান স্বামী। ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নিষ্ফল জেনে চাম্পাবতী গাজীর সঙ্গে আংটি বদল করলে। রাত পোহাবার আগে পরীরা ঘুমন্ত গাজীকে পৌঁছে দিলে সোনাপুরে। চাম্পাবতী এই ব্যাপার শুধু তার মায়ের কাছে বললে। মা উপদেশ দিলেন কথা গোপনে রাখতে এবং শিবপূজা করতে, তা হলে স্বামীকে "শিবের কৃপায় তুমি ঘরে বসি পাবে"। মায়ের কথা শিরোধার্য করলে সে।

সাধনেতে চাম্পাবতী হইল এমন
যেই দিগে যেই ঘড়ি ফেরায় নয়ন।
সেই দিগে গাজী-রূপ করে ঝিকিমিকি
নয়ন ভরিয়া তাহা দেখে বিধুমুখী।…
আপনাকে আপে ধনী পাসরিয়া গেল
গাজীর রূপেতে তখন গাজী হইয়া গেল।

চাম্পাবতীর বিরহে ব্যাকুল হয়ে কালুকে নিয়ে গাজী চললেন মুকুটরায়ের রাজধানী ব্রাহ্মণনগরে। পথে কালু সব কথা শুনে ভর্ৎসনা করে বললেন

এয়সা বাত মুখে তুমি কিরূপেতে বল
বাদশাই করিতে তবে কিবা দোষ ছিল।

তবে কেন ঝুটমুট ফকির হইলে
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছাড়িতে নারিলে।

তার পর দুজনে চলল কথা-কাটাকাটি বৈষ্ণব-পদাবলীতে শুক-শারীর দ্বন্দ্বের মত।

কালু বলে নারী জন্যে খোদাকে হারাবে
গাজী বলে নারী ধন্যা খোদাকে মিলিবে।
কালু বলে দেহমূর্ত্তি নাহিক খোদার
গাজী বলে যত দেখ খোদার আকার।
চাম্পাকে পাইবে কবে কালু-শাহা বলে
গাজী বলে দুই মন যবে যাবে মিলে।
কালু বলে কি করিবে তাহাকে পাইলে
গাজী বলে সে পার সাগরে যাব মিলে।…
কালু বলে চাম্পা এখন আছেন কোথায়
যে দিকে ফিরাই আঁখি দেখি যে তথায়।

গাজীর মনে সর্বদাই চাম্পার রূপভাবনা,

ছলছল দুটি চক্ষু যার পানে চায়।
বুক ফাটি প্রাণ তার নেকলিয়া যায়।

তিন মাস পর্যটনের পর দু-ভাই পৌঁছলেন ব্রাহ্মণনগরের উপকণ্ঠে কান্তিপুরে। আস্তানা গাড়া হল নদীর কিনারায় কদমগাছের তলায়। অপর পারে রাজবাড়ীর অন্দর-ঘাট। শিব এসে গাজীকে উপদেশ দিলেন কালুকে ঘটক করে রাজসভায় পাঠাতে। রাজসভায় উপস্থিত হয়ে কালু গাজীর মহিমা বর্ণন করতে লাগলেন। যথা

বোজরগি দেখিয়া তার কতই ব্রাহ্মণ
পৈতা ছিঁড়িয়া তারা হইল যবন।

তারপর গাজী-চাম্পার প্রণয়গভীরতার উল্লেখ "শুনিয়া লজ্জায় রাজা নাহি তোলে মাথা"। রাজা কালুকে বন্দী করলে। কন্যা লুকিয়ে পড়ে বাপের রোষ থেকে আত্মরক্ষা করলে। গাজী তখন "বাওভরে" সুন্দরবনে গিয়ে তাঁর ব্যাঘ্রবাহিনী নিয়ে এলেন। বাঘদের ভেড়া বানিয়ে নদীপার করা হল। সকালে বাঘদল নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে ব্রাহ্মণনগরে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু করে দিলে। বিপদ দেখে রাজা

চলল দক্ষিণরায়ের কাছে বিবিধ নৈবেদ্য নিয়ে। উপচার প্রাচুর্যে খুশি হয়ে দক্ষিণরায় রাজাকে আশ্বাস দিলেন,

এই ঘড়ি যাব আমি থাক খোশালেতে
মারিব সকল বাঘ ফকির সহিতে।

তারপর দক্ষিণরায়ের যুদ্ধসজ্জা,

ধুতি এক পরিলেক লম্বা আশী গজ
মস্তক উপরে দিল আশী মণ তাজ।
সহস্র মণের এক জিঞ্জির কোমরে
কসিয়া বান্ধিল বীর ধুতির উপরে।

পোষাকের অনুপাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দক্ষিণরায় রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। বাঘেরা করল তাড়া। দক্ষিণরায় পশ্চাৎপদ হয়ে গঙ্গার শরণ নিয়ে তাঁর কুম্ভীরবাহিনী চাইলেন। গাজীর বিরুদ্ধে কুমীর পাঠাতে গঙ্গা রাজি হলেন না। দক্ষিণরায় কাতর হয়ে বললেন

বুঝিনু যবনে পূজা করিবে তোমার
নিদয়া হইলে তাই উপরে আমার।
কুমীর না দিলে যদি আমার তরেতে
প্রাণ তেয়াগিব আমি তোমার সাক্ষাতে।

তখন গঙ্গা কুমীর দিতে রাজি হলেন এই সর্তে, "এই কথা কোন মতে গাজী নাহি শোনে"। কুমীরের আক্রমণে বাঘদল হটে গেল। গাজী তখন আল্লার কাছে মেগে নিলেন "অগ্নির সমান রৌদ্র"। রোদের চোটে কুমীরেরা জলে প্রবেশ করলে। দক্ষিণরায় তখন গৌরীর কাছে চাইলেন ভূতপ্রেত পিশাচ সৈন্য। গৌরী তাঁকে নিষেধ করলেন গাজীর সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে। কেননা "পাতালে বলির কন্যা গাজীর জননী" এবং গাজীর সঙ্গে চাম্পাবতীর বিবাহ দৈবের নির্বন্ধ। দক্ষিণরায় আত্ম-হত্যার ভয় দেখালে গৌরী তাঁর অনুরোধ মানতে বাধ্য হলেন। ভূতের ভয়ে বাঘ ভাগল। তখন গাজী সৃষ্টি করলেন বেড়া আগুন। আগুন দেখে ভূত পালাল। বাঘেরা ঘিরে ফেললে দক্ষিণরায় ছাড়লেন এক ডাগর হাঁক, বাঘেরা সব অজ্ঞান হয়ে গেল। রায় গদা নিয়ে গাজীকে আক্রমণ করলেন। গাজী আসাবাড়ি ছুঁড়লেন। রায় তা ভেঙে দিলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে গাজী খড়ম মারলেন। রায় মাটিতে পড়লেন। গাজী ছুরি নিয়ে রায়ের গলায় পেঁচ বসাতে গেলেন। রায় কাতর হয়ে মাফ

চাহিলেন। দক্ষিণরায়ের যুদ্ধ খতম হলে পর রাজা নিজে নামলেন সংগ্রামে। রাজার অন্তঃপুর দুর্গে আছে জীয়ক-কুণ্ড। বাঘের কবলে যত সেনা মারা পড়ে সব বেঁচে ওঠে জীয়ক কুণ্ডের জল ছিটোলে। বেগতিক দেখে বাঘেরা জীয়ক-কুণ্ডে গোমাংস ফেলে জলের গুণ নষ্ট করে দিলে। এখন রাজাকে হার মানতে হল। গাজী চাম্পাবতীকে লাভ করলেন।

শ্বশুরালয়ে কিছুকাল কাটিয়ে দু-ভাই আবার রাহী হল। এবার সঙ্গে চাম্পাবতী। পরিব্রাজক ফকীরের নারীসঙ্গ শোভন নয় বুঝে গাজী চাম্পাবতীকে একস্থানে শেওড়া গাছ করে রেখে গেলেন পাতালপুরীতে। সেখানে বড় ভাই জুলহাস ও তাঁর পত্নী পাঁচতুলাকে সঙ্গে নিয়ে এসে আবার চাম্পাবতীকে মানুষ করে দিলেন। তারপর পাঁচজনে ফিরে এলেন বাপ-মায়ের কাছে বিরাটনগরে।

এই বিষয়ে অপর রচনা হচ্ছে সৈয়দ হালু মিঞার 'বড়ে খাঁ গাজীর কেরামতি' এবং আবদুল রহীমের 'গাজীর পুথি'। আবদুল রহীম সম্ভবত ময়মনসিংহের লোক ছিলেন। এই কাহিনীতে গাজীর পত্নীর নাম লাবণ্যবতী।

দক্ষিণরায়ের সঙ্গে সংঘর্ষ ছাড়াও গাজীর একটি বিশিষ্ট মাহাত্ম্য-কাহিনী মুসলমান কবির লেখনীর রসদ জুগিয়েছিল। এই ছোট পাঁচালী-কবিতার নাম 'মদন-পালা'। কলিকাতার দক্ষিণে মেদনমল্ল পরগনার জমিদার মদনরায় বাকি খাজনার দায়ে পড়ে ঢাকায় নবাব শায়েস্তা-খানের দরবারে লাঞ্ছিত হয়েছিল। অবশেষে গাজী সাহেবের কাছে মানত করে উদ্ধার পায়—এইটুকুই গল্প।

১১

ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়ার কাহিনী

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কোন কোন মুসলমান লেখকের রচনায় হিন্দু-বিদ্বেষ, বিশেষ করে হিন্দুকে মুসলমান করবার আগ্রহ প্রকট হল। এর মধ্যে উত্তরপশ্চিম ভারতের গোঁড়া মুসলমানদের উর্দূ রচনার বেশ প্রভাব আছে। এই ধরণের রচনার একটি ভালো নিদর্শন শান্তিপুর-নিবাসী মহীউদ্দীন ওস্তাগরের 'সাগুফি সুলতান' (বা 'পাঁড়ুয়ার কেচ্ছা')। ত্রিবেণীর কাছে যে পাণ্ডুয়া ("ছোট পেঁড়ো") আছে—যার প্রাচীন দরগার উঁচু মিনার ট্রেন থেকে দেখা যায়—সেস্থান শাহা-সুফীর আস্তানা বলে বহুকাল থেকে প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলে কি করে মুসলমানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল সে সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি আছে তার উপরে জোবড়া রঙ ফলিয়ে পাঁড়ুয়ার এই "কেচ্ছা" লেখা হয়েছে। এর মূলে আছে কোন হিন্দী বা উর্দূ কেতাব। কেচ্ছার উপক্রমে কবি লিখছেন

বড় পেঁড়ো ছোট পেঁড়ো তিরবেনী আর
পীরের খাতেরে আল্লা করেছেন তৈয়ার
তিন পীরে তিন স্থান বক্‌শেশ করিল
তিন পীর তিন স্থানে জাহের হইল।
কুতুব জেন্দা রহিল বড় পেঁড়ো ধামে
গৌড়-বাদশাহী যার জাহের আলমে।
জাফর-খাঁ গাজী রহিল ত্রিবেণী স্থানে
গঙ্গা যারে দেখা দিল ডাক শুনি কানে।
আল্লার পেয়ারা পীর শা-সুফী সোলতান
পাঁড়োয়া মকান মাঝে করেন মকান।
এখাতেরে পাঁড়োয়া যে জাহের আলমে
শিরনি খতম হয় শাহ-সুফী নামে।
এয়ছা ভাতে কত লোক করে কহা শুনা
নাহি জানে কোনরূপ নেহাৎ ঠিকানা।

আমি বান্দা গোনাগার পাঁড়োয়াতে যাইয়া
দেখিনু মনুরা ঘর নেহাৎ করিয়া।
বাদশাহী মকান হেন হয় অনুমান
দেল জুড়াইয়া যায় দেখিয়া মকান।
দানাই মুরুব্বি যারা পাঁড়োয়াতে আছে
খবর পুছিনু যেয়ে তাহাদের কাছে।
নেহাৎ খবর কেহ কহিতে নারিল
এখাতেরে দেলে মেরা আফছোছ করিল।
খামোসে রহিনু আমি না পেয়ে সন্ধান
পেরেসানে এক সাল হৈল গুজরান।
বহুতর আলেমের নিকটে যাইয়া
পুছিনু খবর খুব আজিজি করিয়া।
মমিনদ্দি ওস্তাগর শান্তিপুরে বাড়ী
কেতাব এক পাইলাম নিকটে তাহারি।
হিন্দী জবানেতে সেই কেতাব আছিল
পড়িয়া সকল ভেদ মালুম হইল।
আগাগোড়া জেনে দেল হইল খোসাল
এখাতেরে লিখিতেছি সে সকল হাল।

তারপর কাহিনী শুরু। পাণ্ডুয়া নগরে ছিল পাণ্ডু রাজা, অশেষ সৌভাগ্যশালী ও পুণ্যবান্। তাঁর অন্দর মহলে এক কুণ্ড ছিল যার জলে তেত্রিশ কোটি দেবতার অধিষ্ঠান।

এয়ছা কেরামত ছিল সে পানীর গুনি
মোর্দা দিলে জিন্দা হইত কুদরতে রব্বানি।

পাণ্ডু-রাজার আমলে পাণ্ডুয়ার বাসিন্দা ছিল সব হিন্দু, কেবল পাঁচ ঘর মুসলমান।

কাফেরের কাছেতে মোমিন মোছলমান
বাঘের নিকটে রইত বকরির সমান।
এছলামের কারবার করিতে নারিত
করিলে পাণ্ডব-রাজা সাজা দেলাইত।

মনের দুঃখে পাণ্ডু-রাজার মুসলমান প্রজারা গোপনে আল্লার দরগায় দোয়া মাগত

এলাহি আলমিন আল্লা জগতের সার
কুফরে গারদ কর পাক করতার।
তোমার কুদরত আল্লা কে বুঝিতে পারে
কাফেরে বাড়ালে এত দুনিয়া ভিতরে।...
এয়ছা দিন কর তুমি এলাহি আলমিন
খুশিতে জাহের হোক মহাম্মদি দীন।

একদিন এক মুসলমান প্রজা পুত্রজন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গোবধ করেছিল। পড়শী হিন্দুরা টের পেয়ে ছেলেটিকে মেরে ফেলে। ছেলের বাবা রাজার কাছে নালিশ করলে। রাজা অভিযোগ গ্রাহ্য করলে না। তখন ছেলের মৃতদেহ নিয়ে সে চলল দিল্লীতে, এই ভেবে যে বাদশাহকে

আনিব সঙ্গেতে করি পাণ্ডব-শহরে
লড়িয়া পাণ্ডব-রাজে দিব ছারখারে।

দিল্লীর তথ্‌তে তখন ফীরোজ-শাহ আসীন। অভিযোগ শুনে তার ভাইপো শাহ-স্ফীকে পাঠালে ফৌজ দিয়ে পাণ্ডুয়ায়। শাহ-স্ফী এসে তাঁবু গাড়ল বালুহাটায়। তারপর লাগল যুদ্ধ। জীয়ত-কুণ্ডের প্রভাবে রাজার সৈন্য-ক্ষয় হয় না, শাহ-স্ফীও যুদ্ধে পেরে ওঠেন না। এমনভাবে বছর কেটে গেল। শাহ-স্ফী হলেন হতাশ। তিনি দিল্লীতে ফিরে যাব যাব করছেন এমন সময় পাণ্ডু-রাজার এক হিন্দু গোয়ালা প্রজা, নাম নগর ঘোষ, শাহ-স্ফীর কাছে এসে জীয়ত-কুণ্ডের কথা ব্যক্ত করলে। নগর ঘোষ মুসলমান হল এবং যোগীর বেশে রাজার অন্তঃপুরে ঢুকে গোপনে জীয়ত-কুণ্ডে গোমাংস ফেলে দিয়ে কুণ্ড-জলের মাহাত্ম্য নষ্ট করে দিলে। উপায়ান্তর না দেখে রাজা ও রাজমন্ত্রীরা সপরিবারে ত্রিবেণীতে গঙ্গায় প্রবেশ করলে। পাণ্ডুয়া মুসলমান ফৌজের দখলে এল। এক বিরাট্ মসজিদ্ তুলে শাহ-স্ফী সেখানেই রয়ে গেলেন আজীবন। কাহিনী এইখানেই শেষ। তারপর লেখকের বিশিষ্ট মন্তব্য

শোন হে আল্লার বান্দা যত বেরাদর
বহুত মোমিন আছে পাঁড়োয়ার মাঝার।
শত শত আয়মাদার পাঁড়োয়াতে ছিল
কালেতে তাহারা খুব লায়েক হইল।

এনাম জায়গীর পেয়ে শাহ-স্ফী শাহার
আজ এক করে ভোগ পাঁড়োয়া মাঝার।
দুই ঘর হিন্দু লোক সেথা ছিল যারা
এখন দৌলৎওলা হইয়াছে তারা।
হিন্দুয়ানি কাম যত করিবারে চায়
আয়মাদার লোক তাহা করিতে না দেয়।
এহা লয়ে মধ্যে এক কাজিয়ে হয়েছিল
হিন্দু লোকে কাচারিতে নালিশ করিল।
সুখের ইংরাজ-রাজ্য বড় সুবিচার
হুকুম না দেন দেখে আইন যাহার।
বুঝহ তামাম লোক করিয়া ধেয়ান
কেছা পীর ছিল সেই শা-স্ফী সোলতান।...

উত্তরবঙ্গে মহাস্থানের ঐতিহ্য নিয়ে আবদুল মজিদ লিখেছিলেন 'ছোলতান বলখি'॥

১২

ভুরশুট-মান্দারনের লেখক

পশ্চিম বাংলায় ইসলামি পীঠস্থান পাওয়া ছিল দুটি। শাহ-সুফীর আস্তানা ত্রিবেণী-পেঁড়োর কাহিনী বলেছি। দ্বিতীয় পেঁড়ো ছিল হাওড়া-হুগলী সীমান্তে ভুরশুটে। কবি ভারতচন্দ্রের নিবাস বসন্তপুর এই পেঁড়োরই উপকণ্ঠে। দক্ষিণ রাঢ়ের ভুরশুট-মান্দারন খুব প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জনপদ। এখানে সুফী-খাঁ বা ইস্মাইল গাজীকে উপলক্ষ্য করে একটি পীরস্থান গড়ে উঠেছিল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা ধর্মমঙ্গল-মনসামঙ্গল প্রভৃতি পাঁচালী কাব্যের দিগ্‌বন্দনায় গায়ক-কবিরা সুফী-খাঁকে নতি জানাতে ভোলেন নি। পরবর্তী কালে সুফী-খাঁ হয়েছেন বড়-খাঁ। এই সঙ্গে হিজলীর তাজ-খাঁ মসনদ-আলীর ঐতিহ্যও মিশে গিয়েছিল। এই বড়-খাঁ গাজীকে আশ্রয় করেই ভুরশুট-মান্দারনে ইসলামি সাহিত্যের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই সাহিত্যের ভাষায় বিশিষ্টতা দেখা গেল আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের বাহুল্য। ভারতচন্দ্র এবং রামমোহন রায় ছিলেন এই অঞ্চলের লোক। সুতরাং এই অঞ্চলের সাহিত্যিক ইসলামি বাংলা তাঁদের জানা ছিল বলে মনে হয়। তাঁদের রচনা রীতিতে আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য এই প্রভাবের ফল বলেও মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে বাঙালী কবির ইসলামি ঢঙের হিন্দী রচনার প্রথম প্রচেষ্টার উল্লেখ করা উচিত। এ রীতি পাচ্ছি সর্বপ্রথম কৃষ্ণরাম-দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে। একটু উদাহরণ দেওয়া গেল,—বড়-খাঁ গাজীর কটূক্তি দক্ষিণরায়ের ও তাঁর ভক্ত সদাগরের উদ্দেশে,

> ভাগ গিয়া * * * কিয়া করে আব
> হোগা হারামজাদ খানে খারাব।
> শোনতে হো দক্ষিণরায় এছা দাগাবাজী
> বাঁধকে লে আনেছে তবে হাম গাজী।
> কালানল শেরকু তোড়নে কহে কান
> সিতাব দেখনে চাই কেছাই সয়তান।...

ভুরশুট-মান্দারনের মুসলমান কবিগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে পুরানো লেখক যাঁর রচনা পাওয়া গেছে তিনি গরীবুল্লা। এঁর জীবৎকাল জানা নেই। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এঁর "আমীর-হামজা" কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড লিখেছিলেন সৈয়দ হামজা। সুতরাং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের নিশ্চয়ই বেশ কিছুকাল আগে গরীবুল্লার কাব্য লেখা হয়েছিল। গরীবুল্লার 'ইউসুফ-জেলেখা'-র উপসংহারে দেশের শাসকবর্গের উল্লেখ থেকে মনে হয় যে তখনও ইংরেজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। গরীবুল্লার নিবাস ছিল বালিয়া পরগনায় হাফেজপুর গ্রামে।

গরীবুল্লার লেখা দুখানি কাব্য পাওয়া গেছে, 'আমীর-হামজার জঙ্গনামা' ও 'ইউসুফ-জেলেখা'। দুটি কাব্যকাহিনীরই বক্তা দরিয়া-পীর বদর, শ্রোতা বড়-খাঁ গাজী। আমীর-হামজায় ঈরানের শাহা নওশেরবানের সঙ্গে হজরৎ নবীর খুড়া ও পদাধিকারী ওসমানের যুদ্ধ বর্ণনা প্রধান স্থান নিয়েছে। দ্বিতীয় কাব্যটির উপজীব্য ফারসী কবি নুরুদ্দীন জামীর 'য়ুসুফ্-ব-জুলয়্খা'। গরীবুল্লার কাব্যে পীর বদর বড়-খাঁ গাজীকে ইউসুফ-জেলেখার কাহিনী বলছেন তাঁকে ফকীরি পন্থায় লওয়াতে।

> বদর বলেন গাজী তোমাকে সমঝাই
> ইফসুফ নবীর বাত শুন মেরা ভাই।

গাজী আগ্রহ করে উত্তর দিলেন

> ইউসুফ নবীর কথা কহ দস্তগীর
> শুনিলে আল্লার রাহে হইব ফকীর।

তখন

> আল্লার দরগায় বদর নোঙাইয়া মাথা
> কহিতে লাগিল ইউসুফ-জেলেখার কথা।

দক্ষিণরাঢ়ের প্রাচীন কবিদের মত গরীবুল্লাও বড়-খাঁ গাজীর সাক্ষাৎ অনুগ্রহ লাভ করে গ্রন্থকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ইউসুফ জেলেখায় বারবার পাই

> গরীব ফকীর কহে কেতাবের বাত
> বড়-খাঁ বাতুনে যারে দিল মোলাকাৎ।

প্রাচীন হিন্দু কবিদের মত তিনি পালা শেষ করে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই জন্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন

> গরীব ফকীর কহে সব এয়াদ্‌গারে
> সের সালামৎ আল্লা রাখ সবাকারে।

এখানে রহিল গীত পালা হৈল সায়
আল্লা আল্লা বল ভাই দিন বয়্যা যায়।
আল্লা তালা সালামৎ রাখিবে বাদশারে
সের সালামৎ রাখ বাদশার উজীরে।
দোখজ আজব হৈতে জরাও করতারে
ইমান বজায় রাখ মোমিন সবারে।
বজায় সালামৎ রাখ বাজার দেওানে
শিকদার তোকদার ইজারদার জনে।
মণ্ডল কমদম আর তামাম প্রজায়
সের সালামৎ আল্লা রাখিবে সবায়।
যেই জন শোনে এই জেলেখার বয়ান
দেল-রওশন রাখে আল্লা বাহাল ইমান।
এই ত গ্রামের বিচে আছে যত জন
সবাকারে সালামতে রাখ নিরঞ্জন।
কার নাম জানি কার নাম নাহি জানি
সবাকারে সালামতে রাখিবে রব্বানি।
আসরে বসিয়া যত হিন্দু-মুসলমান
সবাকার তরে আল্লা হও নেঘাবান।
ইউসুফ-জেলেখার গীত পালা হৈল সায়
নেহ ভাই আল্লার নাম দিন বয়্যা যায়।
গরীব ফকীর কহে কেতাবের বাত
নায়েকের তরে আল্লা বাড়াও হায়াৎ॥

"অধীন গরীব" ভনিতায় 'সত্য-পীরের পুথি বা মদন-কামদেব পালা' মিলেছে। কাব্যটি ছাপা হয়েছে ওয়াজেদ আলীর নামে যদিও শেষ ভনিতায় ছাড়া সর্বত্র রয়েছে গরীবের নাম। এটি এই গরীবুল্লার রচনা কিনা বলা দুরূহ।

গরীবুল্লার অনুসরণ করেছিলেন সৈয়দ হামজা। এর পৈতৃক নিবাস ভুরশুট পরগনায় উদনা (বা অহনা) গ্রামে। ১১৯৯ সালে দামোদরের হানায় বাড়ি-ঘর ক্ষেত-খামার সব নষ্ট হয়ে গেলে হামজা উঠে এসেছিলেন বায়ড়া পরগনায় রানাঘাট

গ্রামে। হামজার পিতামহ আবদুল কাদের, পিতা হেদাতুল্লা, দুই ছেলে কলিমুদ্দীন ও কুতুবুদ্দীন। এই পরিচয় মিলেছে জৈগুন-কাব্যের ভনিতা ও উপসংহার থেকে।

রসুলের পাউতলে সৈএদ হামজা বলে
ঘর ছিল ভুরশুট উদানা
সন নিরানই সালে আমার কপাল-ফলে
বাড়িতে পড়িল তিন হানা।
চাষবাস যত ছিল বাড়ি-ঘর সব গেল
ভরা-ডুবি হৈল মাঝ মাঠে
দেলেতে আফসোস বড়া হইয়া যে গাঙ ছাড়া
পরগনা বায়েড়া রানাঘাটে।...
ভুরশুট পরগনা বিচে উদানা বাগের নীচে
বসবাস কদিমি মোকাম
আবদুল কাদের দাদা তার বড়া দেল সাদা
বাবা মেরা হেদাতুল্লা নাম।
কলমদ্দি বড় বেটা কুতুবুদ্দি তার ছোটা
এই দুই মাসুম আমার
এহা সবাকার তরে যে কেহ মেহের করে
আল্লা তালা ভালা করে তার।
তামাম হইল পুথি বাকি যে করিলেম ইতি
আশাপূর্ণ হইল আমার
এই পুথি যে পড়িবে আর যাহারা শুনিবে
খএর আল্লা করে তা-সবার॥

রচনা প্রাচুর্যে সৈয়দ হামজা ইস্‌লামি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কবি। এঁর প্রথম রচনা 'মধুমালতী'। এই কাহিনী নিয়ে আগে অনেক মুসলমান কবি কাব্যরচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় রচনা 'আমীর-হামজা' দ্বিতীয় (ও বৃহত্তর) খণ্ড, গরীবুল্লার কাব্যের অনুবৃত্তি। নিজের রচনার উপক্রমে হামজা এই কৈফিয়ৎ দিয়েছেন

আল্লার মকবুল শাহা গরীবুল্লা নাম
বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম।

আছিল রওশন-দেল শায়েরি-জবান
যাহাকে মদদ গাজী শাহী বড়েখান।
শায়েরি করিলেন পুথি আমীর-হামজা
না ছিল কেতাব রুজু তামাম কেচ্ছার।
তামাম কেতাব যদি পাইতেন দেওয়ান
গাঁথিত কবিতাহার মুক্তার সমান।
যতদূর আছে তার কবিতার হার
দেখিয়া শুনিয়া লোগ হয় জারজার।
কেচ্ছার পহেলা আদা শুনিয়া আলম
আখেরি কেচ্ছার তরে করে বড়া গম।
না জানি কেমন কথা আছে আখেরিতে
কোনখানে আমীর লড়িল কার সাতে।
এমনি তল্লাস লোগ করে যেথা সেথা
কাহেলি করিয়া কেহ না করে কবিতা।
কামেল ফাজেল লোগ যত কবিকার
কেহ না করিল কবি আখেরি কেচ্ছার।
লোগের খায়েশ দেখি ভাবি মনে মনে
আখেরি শায়েরি পুঁথি হইবে কেমনে।
না পারিনু এড়াইতে লোকের নেহেরা
এখাতেরে কবিতার খাহেশ হৈল মেরা।...
পীর শাহা গরীবুল্লা কবিতার গুরু।
আলমে উজালা যার কবিতার শুরু।
আমার শায়েরি নয় কেতাব সমান
কেবল বুঝিবে লোগ কেচ্ছার বয়ান।

আমীর হামজার কাহিনী বরাবর পয়ারে দৌড় করিয়ে এনে শেষকালে কবির খেয়াল হল যে ত্রিপদী বাদ গেছে। তখন জুড়ে দিলেন কৈফিয়ৎ ত্রিপদীতে,

কবিতা তামাম হৈল ত্রিপদী না লেখা গেল
সারা পুথি হইল পয়ার
সবাকে হইল ধন্দ কবিতা ত্রিপদী ছন্দ
যোগ্যতা না ছিল হামজার।

তাহার বয়ান কবি কেতাব হইল ভারি
পুথি হৈল চৌগুণ তাহার
কবির জেওর দিতে খুব-ভাতে সাজাইতে
জেন্দেগি না হয় এতবার।
চাকর পরের ঠাই লিখিতে ফোরসৎ নাই
এখাতেরে পয়ারে রচিত
কোনরূপে বাঙ্গাল্লায় জঙ্গনামা লেখা যায়
তবে যার যেমন উচিত।

উপসংহারে হামজা ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে ক্ষমা চেয়েছেন এবং রচনায় গায়ক-পাঠকের হস্তক্ষেপ নিষেধ করেছেন। তারপর কাব্যরচনা কালের নির্দেশ (১১৯৯-১২০১ সাল),

বোরহানার মাতারি যে আরব্বের বিচে
ওতারিয়া ছিল বিবি পাহাড়ের নীচে।
সেই হদ্দ শায়েরি হইয়াছিল আগে
এগার শও নিরানই সাল মাহা মাঘে।
না ছিল ওরক দুই কেতাব আখেরি
এ খাতিরে আখেরি লিখিতে হৈল দেরি।
বার শও এক সাল বাঙ্গালার শেষে
কেতাব মিলিল মুঝে বহুত কোশেশে।
করিনু শায়েরি পুথি আখেরি কেচ্ছার
লেখা গেল শাহাদৎ আমীর-হামজার।
বার শও এক সাল আখেরি হিসাবে
বার দিন ছয় মাস হিসাবেতে হবে।
চাঁদের তারিখ আছে পহেলা রমজান...

গরীবুল্লা ও সৈয়দ হামজার 'আমীর-হামজার জঙ্গনামা' বিরাট বই, আকারে কাশীরাম-দাসের ভারত-সংহিতার কাছে খাটো হবে না।

তৃতীয় রচনা 'জৈগুনের পুঁথি' হচ্ছে হানিফার জঙ্গনামা। এটির রচনাসমাপ্তি-কাল ২৩ আশ্বিন ১২০৪ সাল (১৭৯৭ খ্রী),

ত্রিপদী করিয়া ছন্দ করিয়া তারিখ বন্দ
লেখা গেল তেইশে আশ্বিনে
বার শও চারি সালে জোম্মার নামাজকালে
বাকি সে মাসের সাত দিনে।

সৈয়দ হামজার চতুর্থ (ও শেষ ?) রচনা 'হাতেম তাইর কেচ্ছা'। রচনা শেষ হয়েছিল ১২১০ সালে (১৮০৪ খ্রী)।

এক শও একুশ লিখি তাঁর পিঠে শূন্য রাখি
মনের ঠিকানা পাবে তায়
বাঙ্গালা আখের সালে গরমির বাহার কালে
পুথির তারিখ হেথা জায়।
দেলহজ্জ চাঁদের শেষে আখেরি ফাল্গুন মাসে
কেচ্ছার তারিখ করি বন্দ
যে এক রসিক হবে ওজন বুঝিয়া লিবে
পুঁথিখান করিবে পছন্দ।

ফারসী গ্রন্থ অবলম্বনে হাতেম তাইর কেচ্ছা লিখিতে হামজাকে অনুরোধ করেছিলেন শাহা এর্জতুল্লা। ষষ্ঠ, কবিত্বস্ফূর্তিহীনতা, প্রশ্নের কাহিনী লেখবার পর কবির কলম বন্ধ হল নানা কারণে, ফুরসতের অভাব, উৎসাহদাতার বিরাগ, ইত্যাদি। কিছু কাল যায়। ভুরশুট পরগনায় বসন্তপুর গ্রামনিবাসী চাঁদ মোল্লার ছেলে কালু মোল্লা (সাধুভাষায় শেখ কলিমুল্লা) একদিন কবিকে সমঝিয়ে দিলে যে রচনা অসমাপ্ত রাখা উচিত নয়। তখন কবি আবার "কলমের ঘোড়া" খেঁচলেন। কেচ্ছা সম্পূর্ণ হল। হামজা লিখছেন

মিঞা শাহা এর্জতুল্লা কহিলেন আমায়
হাতেম তাইর কেচ্ছা লেখ বাঙ্গালায়।
কহিলেন কেচ্ছার কেতাব মুঝে দিয়া
হাতেমের কেচ্ছা দেহ বাঙ্গালা করিয়া।
পহেলা আল্লার নামে করিয়া ছকুদ
তার পরে নবী-নামে ভেজিয়া দরুদ।
নমুদ করিনু জবে পুথি লিখিবার
না মেলে ফোরছত জিউ না হয় কারার।

ছয় সওয়ালের কেচ্ছা হইবে তামাম
কলমের ঘোড়া জেরা তুড়িয়া লাগাম।
আগু নাহি চলে আর কলমের ঘোড়া
বাগ-ডোর তুড়িয়া হইল ফিরে খাড়া।
কহিল আমাকে তুমি নাহিক চালাও
আমি পেরেসানি হই তুমি দুঃখ পাও।
সর্বলোকে সাএর করিল আল্লা নবী
দেশেতে রসিক নাই কে শুনিবে কবি।
এখাতেরে সেইখানে দিয়েছিনু খেমা
কলিমোল্লা কহিলেন করিতে তরজমা।
ভুরশুট-বসন্তপুরে বসতি মোকাম
চাঁদের ফরজন্দ শেখ কলিমোল্লা নাম।
সেই লরকা বোঝাইয়া কহিল আমায়
আধা কাম করা কভু নাহি শোভা পায়।
লেখ তুমি এলাহি মোরাদ যাকে দিবে
সে লোক কবিতা-হার কিনিয়া পড়িবে (=পরিবে)।
কবি শোনা কৃপণ লোকের কাম নয়।
পুথি কে শুনিবে ভাই ঘরে কাম রয়।
কালুর কথায় ফের খেচিনু কলম
আল্লা যদি করে পুথি করিব খতম।
হাতেমের হপ্তম সওাল এই হদ
পুঁথির পড়নহারা নুর মহম্মদ।
কালু মোল্লা লেখাইল করিয়া নেহার
চাঁদ মোল্লা শুনিলেন ছাহেবের পার।
তালেবর লোকে খেয়ছা কেচ্ছা যে রাখিয়া
রাতিকালে কেচ্ছা শুনে পালঙ্গে শুইয়া।
ঘায়েস হইবে জবে কেচ্ছা শুনিবার
পড়িয়া শুনাবে কেহ কবিতা আমার।

এহা সবাকার সাতে বড়া মহব্বত
রাখিনু আপনা সাতে শুন হকিকত।
পুথি ছাড়া সেকাএত করে যে আমার
হামজা বলে আকবতে হবে গোনাগার।...

আছে এক খরিদদার এই কবিতার হার
তার গলে পরাইব লিয়া
যে মোরে করার দিল পুথিখানা লেখাইল
কালি কলম আর রসদ দিয়া।
কবিতার বাত কহি দেলেতে বুঝিবে সহি
জতেক রসিক বন্ধুগণ
আছিনু বসন্তপুরে মাইনছি মোল্লার ডেরে
সেইখানে করিনু যতন।
কেচ্ছা মধুমালতীর জঙ্গনামা আমীরের
জৈগুন-পুঁথি লিখেছিনু আগে
আল্লা তালা ভাল করে যাহার খাহেস পরে
হাতেম লিখিনু শেষভাগে।
আল্লা মেহেরবান থাকে হামেসা আবাদ রাখে
মাইনদ্দি মোল্লার খানদান
যাহার মহব্বৎ পরে ভুরশুট বসন্তপুরে
হয় মেরা মুর্দত গোজরান।
নুর মহম্মদ আর চাঁদ মোল্লা ভাই তার
কায়েম মোকাম যেন থাকে
ফরজন্দ সহিত সবে আপনা মেহের ভাবে
আল্লা তালা নেওাজিয়া রাখে।
এ ভাই ভাতিজা আর যত আছে দোস্তদার
সবাকাকে রাখিও নেওাজিয়া
যে জন আমার পরে হামেসা মেহের করে
নানারূপে মহব্বত দিয়া।

দেলে মহব্বত পাই এ খাতেরে গুণ গাই
দোওা করি চিত্তের সহিত
যে কেহ মেহের করে কোন রূপে আমি তারে
জীতে না ভুলিব কদাচিৎ।
যত কেহ দোস্তদার খুসি চাহি সবাকার
তার পরে আপনা ভালাই
আরজ আল্লার আগে তাহার ফর[জ]ন্দ লোকে
নেওাজিও এই দোয়া চাই।
হায়াত মোরাদ দিয়া রাখ দোহে নেওাজিয়া
কলিমদ্দি কুতবদ্দি নামে
আবরু হোরমত থাকে ইমান বাহাল রাখে
হামেহাল রহে [ত]নেকামে।
চাঁদ মোল্লা ভাইজী এহারা করিল কি
পুথিখানা হাতেম তাইর
বহুত খাহেস আছে রাখিব তোমার কাছে
হয় যদি পছন্দ খাতির।
কথায় জেওর দিয়া নানা রূপে সাজাইয়া
বড় দুঃখে করিনু তৈয়ার
যে ঘড়ি খাহেস হবে লোক দিয়া পড়াইবে
দেল তাজা হইবে তোমার।
জমি দেহ দুইখানা সে টাকা নজরআনা
দওলত পোসাক একজোড়া
আপনি আমার বাবে দ্বিতীয় হাতেম হবে
নওাল করিনু থোড়া থোড়া।
আমাকে যে কিছু দিবে আল্লার নজদিগে পাবে
আকবতে জওাব তোমার
রাখিবে এয়াদগারি হামেহাল দোওা করি
আমি আর যত কবিকার।
জেয়াদা লিখিলে পরে আলমে কহিবে মোরে
হামজা বড় গরজের এয়ার

থোড়েক এসারা ভাল সুখে দুঃখে দিন গেল
আকবতে ভরসা আল্লার।
মোরসেদের পাঙতলে সৈয়দ হামজা বলে
ঘর যার উদানা মোকাম
আছিল সৈয়দজাদা আবদুল কাদের দাদা
বাপ মোর হেদাতুল্লা নাম।
আমি এয়ছা গুনাগার দুনিয়াতে নাহি আর
গোজরিল ওম্মর তামাম
পাপেতে ডুবিয়া গেনু আল্লা নবী না ভজিনু
না করিনু আখেরের কাম।
আল্লা নবী পাঞ্জাতন রাখিনু আমার মন
নেককামে না মজে আল্লার
লাগতি সয়তান মোরে ঘড়ি ঘড়ি দাগা করে
ছাড়া না করিতে পারি তার।
আজ্রাকিল দাগাবাজে দাগা দেয় নেক কাজে
আপনি তফাতে রাখ তাকে
আপনার প্রাণ দিয়া রাখ মুঝে নেওাজিয়া
ইমাম বাহাল যেন থাকে।
আল্লা তার করে খয়ের হাতেমের কেচ্ছা ফের
যে কেহ দেখিবে খোস-দেলে
হায়াত মোরাদ দিয়া রাখে আল্লা নেওাজিয়া
সৈয়দ হামজা এহা বলে॥

কাব্যের গোড়ায় কবি কিছু নীতি-উপদেশ দিয়েছেন। এতে সেকালের মুসলমান গৃহস্থ-সংসারের বাস্তব জীবনাদর্শের সুন্দর পরিচয় পাই।

আল্লার হুকুম পরে রাখিবে ইমান
বাহাল রাখিবে যত নবীর ফরমান।
দীনদারি মফাজৎ রাখিবে বাহাল
মা বাপের খেদমত করিবে হামেহাল।
ওস্তাদ পীরের হক করিবে আদায়
দেখাইল রাহা যেই চিনিতে খোদায়।

পড়োস লোকের হক্কে না করিবে বদি
নেকনামি আল্লার হুজুরে লিবে যদি।
হামছায়ার হক ভাই আদায় করিবে
যাহাতে খোদায় তালা খোসাল হইবে।
শিশুকালে মা-বাপ মরিয়া যায় যার
এতিম এছির নাম তাহা সবাকার।
এতিম এছির যদি কান্দে সে কাতরে
আল্লার আরস কাঁপে তার দুঃখ পরে।
এতিম এছির যদি নজদিগে দেখিবে
আপনা লাড়কার মুখে বোছা নাহি দিবে।
কাছে যদি থাকে ভাই বেকছ আওরত
না করিবে আপনা জরুকে মহব্বত।
না লিবে লোকের মাল হরণ করিয়া
কাঙ্গালের চিজ না খাইবে সাতাইয়া।
এ সব লোকের আহা বড়ই জঞ্জাল
দুকূল মজায় আর করে পয়মাল।
নেনাকারি সুদখুরি যে পিয়ে সরাব
হরঘড়ি দুষ্ট কহে খোদার খারাব।
লোকের খেদমৎগারি বড় এবাদত
ভালাই করিলে ভাল হয় আকবত।
লোকের ভালাই কর বুঝিয়া ভালাই
দেখ না হাতেম তাই কি করিল ভাই।
আল্লার আলল পরে যে করে আছান
হেথা সেথা ভাল তার আল্লার ফরমান।
লিখিনু কেতাব মত মান বা না মান
দুধ মদ চিনে খাও ভাল যাহা জান।
হামজা বলে বেফরমানি কৈনু দুনিয়াতে
না জানি কি হাল আল্লা করেন আকবতে।

হামজার হাতেম তাই বেশ বড় বই।

১৩

লয়লা-মজনুর প্রেমকাহিনী

ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক থেকে কলিকাতায় সস্তা ছাপাখানার প্রাচুর্য দেখা গেল। এই ছাপাখানার মালিক ও প্রকাশকদের মধ্যে মুসলমানও ছিল। তবে ইসলামি বাংলা কাহিনীকাব্য মুসলমান প্রকাশকদেরই একচেটে ছিল না, হিন্দু প্রকাশকেরাও এতে সমান উৎসাহী ছিল। অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত মুসলমান জনগণের মধ্যে, বিশেষ করে শহরপ্রবাসী মাঝি-মাল্লা, দোকানী-পসারী, চাকুরে-দালাল ইত্যাদির কাছে আরবী-ফারসী-হিন্দী-আকীর্ণ ইসলামি বাংলার ছোট-বড় বইগুলির বেশ কাটতি ছিল। এই সময়ের ইসলামি পদ্ধতির লেখকদের মধ্যেও ভুরশুট-মান্দারন অঞ্চলের কবিদেরই প্রাধান্য ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান প্রকাশকদের অগ্রণী কাজী সফীউদ্দীন নিজে এই অঞ্চলের লোক ছিলেন এবং এই অঞ্চলের কবিদের দিয়ে প্রচুর বই লিখিয়েছিলেন ফারসী ও হিন্দীর অনুবাদ। এই লেখকের মধ্যে যাঁরা প্রধান ছিলেন তাঁদের রচনার উল্লেখ করছি।

রফি মোল্লার পুত্র, মৌজে শিবপুর-নিবাসী মহম্মদ দানেশ লিখেছিলেন 'গোলবে ছান্নুয়ার', 'চাহার দরবেশ', 'নুরুল ইমান' ও 'হাতেম তাই'। প্রথম বইটি ফারসী 'গুল্-ব-সনৌবার' কাব্যের নেমচন্দ কৃত হিন্দী অনুবাদের তর্জমা। ছাপা হয়েছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। দুবছর পরে দ্বারকানাথ কুণ্ডুর 'গোলবে-সেনুয়ার' বেরিয়েছিল। মহম্মদ খাতের লিখেছিলেন 'মৃগাবতী', 'শাহানামা', 'আখবারুল ওজুদ', 'লয়লা-মজনু', 'তুতিনামা', 'গুল ও হরমুজ', 'সওয়াল জওয়াব', 'মেয়ারাজ-নামা' প্রভৃতি। এঁর নিবাস ছিল বালিয়া পরগনায় গোবিন্দপুর গ্রামে। পিতা মহম্মদ হেছামুদ্দিন, পিতামহ সোন্দর মোল্লা। মৃগাবতী রচনার সময়ে খাতের পিতামহের আশ্রয়ে ছিলেন, "হামেসা আমোদে আছি মিরাসে যাহার"। লয়লা-মজনুর প্রগাঢ় ট্র্যাজিক প্রেমকাহিনী উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালী পাঠকের মনোহরণ করেছিল। যতদূর জানি লয়লা-মজনুর

প্রথম অনুবাদ করেছিলেন চাটিগাঁ-র দৌলৎ উজীর বহরাম। তারপর করেন মহেশচন্দ্র মিত্র দ্বারকানাথ রায়ের সাহায্যে। বই ছাপা হয়েছিল ১২৬০ সালে। খাতেরের লায়লি-মজনু লেখা শেষ হয়েছিল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে,

> বার শত একাত্তর সালে চৌঠা অগ্রহানে
> জুম্মা রোজে হৈল ইতি বড় নেক দিনে।

খাতেরের রচনা অবলম্বনে লয়লা-মজনুর প্রেমকাহিনীর পরিচয় দিই।

আরবে এক প্রতিপত্তিশালী সৌভাগ্যবান্ বাদশা ছিলেন। তাঁর অভাব ছিল শুধু সন্তানের। কিছুকাল পরে আল্লা তালার মেহেরবানিতে তাঁর অপূর্ব সুন্দর পুত্র হল। বাদশা দৈবজ্ঞদের ডাকলেন নবজাতকের ভাগ্য গণনা করতে। তারা গণে দেখে বললে, আপনার পুত্রের যশোভাগ্য খুবই,

> কিন্তু জন্মিল যখন লাড়কা তোমার
> সেই ওক্তে নেক ছিল যোগ ছেতারার।
> কিছু নাহি কহা যায় তকদিরের বাতে
> নছিবের লেখা যাহা কে পারে চিনিতে।
> এই যে ফরজন্দ পয়দা হৈল আপনাকে
> আশকে ছাদেক রবে না যাবে ফাছেকে।
> হইবে আশক এক রূপসী দেখিয়া
> দেওয়ানা হইবে তার ছুরতে মাতিয়া।...
> নছিবের লেখা বুঝে সাধ্য আছে কার
> রহিল কয়েস নাম তোমার লাড়কার।
> মজনু নাম হবে কিন্তু আশক বিচেতে
> হইবে বহুত বিদ্যা থোড়াই দিনেতে।

কয়েসের দশ বছর বয়স হলে বাদশা খুব ধুমধাম করে "খাতনা দেলায় তার ছুন্নতের কাম"। তার পরে পাঠালেন মক্তবে। আহওয়াল সদাগরের সুন্দরী কন্যা লায়লিও মক্তবে ভর্তি হল সেই দিনে। ওস্তাদ দুজনকে খুব যত্ন করে পড়াতে লাগলেন। একসঙ্গে পড়াশোনা করতে করতে তাদের মনে পরস্পর প্রেমের সঞ্চার হল। ওস্তাদ ভালো ভালো বই পড়াতে লাগলেন।

> সেই কেতাবের বিচে আশক মাশুক আছে
> নাহি কিছু পড়ে তার ছেওয়া

রত হয়ে আশকেতে হাসি খেলি কৌতুকেতে
রহে দোহে মিলিয়া ঝুলিয়া।

দুজনের আশক-মত্ততা মক্তবের পড়ুয়াদের কাছে বেশি দিন ছাপা রইল না। তারা সন্ধ্যাবেলায় ঘরে এসে মা-বাপের কাছে বলতে লাগল। শীঘ্রই দেশ জুড়ে বালক-বালিকার এই রোমান্টিক প্রেমতন্ময়তার কথা ছড়িয়ে পড়ল। কবি বলছেন,

গোপনের কথা যাহা রাখিতে কে পারে তাহা
হইবে সে প্রকাশ ত্বরায়
শক্ত লোহা বরাবরে হজম করিতে নারে
পেট ফেটে আপনি বেরায়।

লায়লির মায়ের কানে খবর পৌছলে তিনি মেয়েকে ভর্ৎসনা করে মক্তব থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। লায়লির মক্তবে যাওয়া বন্ধ হল, সে আর মজনুর দেখা পায় না।

বিষাদিত হৈয়া ধনী ভাবিয়া গুণিয়া
হইল উদাসী মত শ্যামে না দেখিয়া।
আশকে তরঙ্গ নদী উথলিয়া উঠে
সেই নীরে ভাসে শ্যামে না দেখে নিকটে।
দুইটা নয়নে বারি চলিল বহিয়া
নাহি হয় নিবারণ শ্যামে না দেখিয়া
আশক আগুন হৈল দ্বিগুণ তাহার
জ্বালাইয়া দেহ তার কঠিন আঙ্গার।
জীউ না ধরিতে পারে বিদরে পরাণ
আশকে সুঁপিয়া মন হইল অজ্ঞান।
খাওয়া পেওয়া গেল তার নিন্দ নাহি চক্ষে
কহে হায় আল্লা তালা কি করিলে মোকে।...

মজনুও লায়লির বিরহে তথৈবচ। তার পড়াশোনা গেল ঘুচে।

তার পাছে কহে মজনু পড়া হৈল ইতি
কি দেখে পড়িব ময়না লিয়া গেছে পাতি
লায়লি বিহনে পড়া নাহি আইসে মুখে
দু-নয়নে বহে বারি নাহি সোজে আঁখে।

প্রেমের বানে মজনুর গৃহবাস ভেসে গেল।

পিন্দিবার জামা-জোড়া ফাড়িয়া ডালিল
লায়লি-প্রেমে ভস্ম মেখে উদাসী হইলু।
প্রাণপ্রেয়সীর আশে লেঙ্গটা পিন্দিয়া
ধরিল ফকির-বেশ প্রেম-টুকনি লিয়া।
দেখিতে প্রেয়সী-রূপ মনের আশাতে।
প্রেমদুঃখী হয়ে মজনু ফিরে পথে পথে।

ঘুরে ঘুরে হাজির হল সে লায়লিদের গৃহদ্বারে। কাদায় আছাড় খেয়ে মজনু ভিক্ষুকের ডাক ডাকলে,

দয়া করে ভিক্ষা দেহ আমি চক্ষুহীনে
তোমাদের আশা পূর্ণ করে নিরাঞ্জনে।

লায়লি হাঁক শুনে বেরিয়ে এল। এই রকমে ভিক্ষা দেওয়া নেওয়ার ছলে দুজনের মিলন হতে লাগল প্রতিদিন। ক্রমশ এই ব্যাপারে লোকের চোখ পড়ল এবং লায়লির মা জানতে পারলে। এবার মজনু এলে তাকে দরওয়ান দিয়ে হাঁকিয়ে দেওয়া হল। মনের দুঃখে মজনু বনে গেল। বাদশা গেলেন তাকে ফিরিয়ে আনতে। কিছুতেই সে আসে না, শেষে লায়লির নাম করায় এল, কিন্তু পাগল উদাসীনের আচরণ সে ছাড়লে না। পুত্রের উন্মাদদশা দেখে বাদশা তাকে এক বড় দরবেশের কাছে নিয়ে গেলেন। দরবেশ এই ঔষধ বাতলে দিলেন

লায়লির হাত হৈতে তাগা বানাইয়া
তাবিজ মজনুর হাতে দিবেক বান্ধিয়া।
আর লায়লি যে মকানে থাকে বরাবর
মাটি থোড়া মাঙ্গাইয়া লিবে সেথাকার।
সেই সে মাটির তরে ছোরমা করিয়া
কয়েসের দুই চক্ষে দিবে লাগাইয়া।
এসব তদবির হৈলে থামিয়া রহিবে
কদাচিৎ সেই নাম মুখে না কহিবে।

তাই করা হল। মজনুর উন্মাদচেষ্টা আর রইল না। তবে লায়লির চিন্তা সে মন থেকে দূর করতে পারলে না। বাদশা খুশি হয়ে সম্বন্ধ করে পাঠালে লায়লির সঙ্গে তার বিয়ের। কিন্তু লায়লির বাপ রাজি হল না পাগল ফকীরকে মেয়ে দিতে

বাদশা বললেন, আমার ছেলে এখন ভাল হয়েছে। তারপর মজনুকে স্নান ও বেশভূষা করিয়ে সওদাগরের বাড়িতে আনা হল। তখন সওদাগর বিয়ে দিতে রাজি হল। বিবাহদিন স্থির করবার কথা হচ্ছে এমন সময় কোথা থেকে এক কুকুর এল। দেখে একজন বললে, লায়লির কুকুর এল কোথা থেকে। এই কথা শুনে ভাবে বিভোর হয়ে মজনু কুকুরের গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। লায়লির বাপ বুঝলে পাগলামি সারে নি। বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেল। বাদশা লজ্জিত অপমানিত হয়ে ফিরে এলেন। মজনুর পাগলামির লক্ষণ সব আবার প্রকট হল। বাদশা তাকে নিয়ে ফের গেলেন সেই দরবেশের কাছে। দরবেশ মজনুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার উন্মাদ-অবস্থা হল কেন। তখন মজনু ফকীরের কাছে নিবেদন করলে

আমারে পাগল এবে কোন জন বলে
প্রেমহার গেঁথে আমি পিন্দিয়াছি গলে।
জমিন হইল তক্ত আমার এখন
যেই তক্ত পয়দা কৈল আপে নিরঞ্জন।...
প্রেমের মুল্লুক বিচে বাদশাই আমার
কহ দেখি লাজ-ভয় করিব কাহার।

সেইখান থেকেই মজনু আবার বনে চলে গেল। সেখানে পাগল হয়ে বাস করত পশুদের সঙ্গে। বাদশাকে ফকীর বললেন ছেলের আশা ছাড়তে।

লায়লির রূপের কথা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশ বিদেশের রাজা-রাজপুত্র তার পাণিপ্রার্থী হয়ে আসছে। অবশেষে তার বিবাহ স্থির হল সালাম বাদশার সঙ্গে। শুনে লায়লি সখীর কাছে খেদ করতে লাগল,

মজনুর বিচ্ছেদ-বাণে হৃদয়েতে তীর হানে
দেহ গেল ঝাঞ্জারা হইয়া
তুই কি কহিবি মোরে জেন্দেগীব আশা ছেড়ে
আছি আমি মজনুর লাগিয়া।

সখী গিয়ে মাকে লাগালে। মা বোঝাতে লাগল

পাঠশালে পড়ে বিদ্যা শিখে যেই জন
হুঁশিয়ার হইয়া করে প্রভুর সাধন।

তুই তো শিখিলি বিদ্যা আশকের বাণী
মজনুকে ইয়াদ কর দিবস রজনী।
পাগল হইয়া সেহ আছে কোথাকারে
তার দায়ে মর তুমি কিসের খাতিরে।
রাখ এবে কথা মোর কর এই কাজ
লোক মাঁঝে রহে যাতে মা বাপের লাজ।
জেওর পোষাক পিন্ধ খুশি হয়ে মন
আজ তোর শুভ সাদী কর গো সাজন।

লায়লি হতাশ হয়ে উত্তর দিলে,

চাহ গলে দিয়া ছুরি মার পরানেতে
আছি তেরা এক্তিয়ারে জিউ চাহে যাতে।
মজনু-প্রেমে প্রেমী হয়ে জীবনের আশা
ছাড়িয়া দিয়েছি আমি না করি ভরসা।

বাসরঘরে লায়লি বরকে যৎপরোনাস্তি অপমান করে বললে,

শুন দুষ্ট তোর তরে কহি বিবরণ
মজনু আমার পতি জানে সর্বজন।
তুমি আইলে মোর পরে দাগ চড়াইতে
আমার মিলন নাহি হবে তেরা সাথে।
আপনার রাহা তুমি লেহ না ঢুড়িয়া
মান বাঁচাইয়া যাও ঘরেতে চলিয়া।...
মোর ভাগ্যে ইহা লিখিয়াছে পরওয়ারে
মজনু আমার পতি আওল আখেরে।

মা-বাপ পরিজন সকলে লায়লিকে ধিক্কার দিতে লাগল।

তারপর লায়লির বাপ মজনুর কাছে কুটনী বুড়িকে পাঠালে, তাকে লায়লির প্রেমযোগ থেকে ভ্রষ্ট করতে। বুড়ী গিয়ে তাকে বললে যে লায়লি বাদশাজাদাকে বিয়ে করে বেশ সুখে আছে। মজনু সত্যমিথ্যা জানবার জন্যে লায়লিকে এই চিঠি পাঠালে আগে একটি গান দিয়ে।

গীত হিন্দি-বাংলা

এ মহব্বত ছোড়কে প্যারী কিছুতেরে ভুলিলে মোরে
ম্যায় তেরা জুদাইছে বাঁচি না রে বাঁচি না রে।
যবছে দেখা হো তুঝে এস্ক গম হই মুঝে
পিলিয়া মহব্বত কা পেয়ালা তবছে ম্যায় ভুলি না রে।
আর শোনা এ মাজেরা ই কেইছা প্রেম-ধারা
গায়রোকে মহব্বত মে পেয়ারি ভুলিলে আমারি তরে।
খুসি কারতি হো সদা তুঝে খোশ রাখে খোদা
হামকো কার দিয়া জুদা আর দুঃখ সহে না মোরে।…

প্রাণ সমতুল্য তুমি প্রেয়সী আমার
হামেহাল মাঙ্গি দোয়া দর্গাতে আল্লার।…
প্রেয়সী কেমনে তুমি আমাকে ছাড়িয়া
বাদশা-বেটার তরে করিয়াছ বিয়া।
খুশি-খোশালিতে দোহে আছ এক সঙ্গে
হাসিখেলা হামেহাল কর নানা রঙ্গে।
আল্লা তালা তোমাদের রাখে মন-সুখে
নব প্রিয়া ঘরে লিয়া রহ দুখে সুখে।
আমিত পুরানা মোরে গিয়াছ ভুলিয়া
তোমার পিরীতে আমি আছি বন্দী হৈয়া।…
তোমার আশকে আমি হইয়াছি বন্দী
বিধি কৈল বনবাসী লোকে হৈল বাদী।
তোমার কথার মতে আছে খালি প্রাণ
স্বর্গ মর্ত্য কোন খানে নাহি দেয় স্থান।
কলম রোদন করে লিখিতে ইহায়
দুঃখ দেখে মুখ চেপে কালি না যোগায়।
তুমি প্রাণ সমতুল্য কি লিখিব পাতি
বাক্য নাহি সরে মুখে লেখা হৈল ইতি।

চিঠি পেয়ে লায়লি এই উত্তর দিলে

তুমি নাথ দুঃখিনীর প্রাণের সমান
হউক তোমার পরে আল্লা মেহেরবান।
আমার ভাবেতে দুঃখী আছহ অন্তরে
ত্যাজ্য করি মাতা পিতা জঙ্গল ভিতরে।…
মোর মত দুখী কেহ নাহি এই ভবে
ললাটে লিখন যাহা তাহা কে খণ্ডাবে।
আল্লা তালা পতি করে পয়দা কৈল তুঝে
তোমার রমণী করে পাঠাইল মুঝে।…
সর্বদা আমোদে আছ কাননে এখন
বাহার দেখিয়া ফির করিয়া ভ্রমণ।
পড়িয়া রয়েছি আমি ঘোর অবস্থায়
বিরহ-অনলে মোর দেহ জলে যায়।
হস্তপদহীন যে করিয়া নিরাঞ্জন
সৃজন করিল ভবে নারীর কারণ।
তুমি সদা মনসুখে খেলহ বনেতে
জঙ্গলেতে পশুপক্ষী সবাকার সাথে।…
দেখিয়া শুনিয়া ফের মনের উল্লাসে।
তমাল আর চন্দনের বাও লাগে এসে।
মনসুখে বন মাঝে মেওয়া খাও কত
আম জাম বাদাম আঙ্গুর আর যত।…
না করিব ধর্মনষ্ট যত দিন যাবে
তব প্রেমে প্রাণ যায় জেন্নতি হইবে।
যদি মোর প্রাণ যায় তোমার কারণ
কদাচিৎ কার তরে না করি আপন।…
লিখন লিখিতে মোর লেখনীর দুঃখ
বলহীন হয়ে আর নাহি খুলে মুখ।
দুই চক্ষে বহে বারি না পাই দেখিতে
ইতি করিলাম আর না পারি লিখিতে।

লায়লির চিঠি পেয়ে মজনুর মন উল্লসিত হল। সে পত্র

যতন করিয়া মজনু চুমিয়া তাহায়
তাবিজ করিয়া রাখে বান্ধিয়া গলায়।

কুটনী ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। মজনু পশুদের সঙ্গে বনবাসে রইল।

একদিন স্বপ্নে লায়লিকে দেখে মজনুর মন খুব উচাটিত হল। সে পাগলের মত ছুটল শহরে। ছেলের দল তার পাছু নিলে। এসে দাঁড়াল লায়লির দরজায়। লায়লি বেরিয়ে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। দরোয়ান মজনুকে কাটতে গেল তরোয়াল দিয়ে, কিন্তু "আঁকড়িয়া গেল হাত আল্লার কুদরতে"। দরোয়ান তখন মজনুর পায়ে পড়ল। মজনু বললে, এমন কাজ আর করো না, "লায়লির ওয়াস্তে খাতা বক্সিনু তোমার"। দরোয়ানের হাত থেকে খাঁড়া খুলে গেল। তাজ্জব হয়ে লায়লি মনে মনে

কহে মজনু হকিকতে রৌশন জমির
মেজাজে জাহেরা যেয়ছা আশক মণির।
এলাহি ইহাকে বড় মোরতবা দিয়াছে
সব আশকের বিচে নামি করিয়াছে।
মিলিবে কিসের তরে আমার সহিতে
মিলিয়াছে বাতুনের ওফাদার সাথে।
খুশি আছে দেল বিচে পাইয়া মাশুক
জলি আমি অভাগিনী পাই এত দুঃখ।

মজনু আবার ফিরে গেল বনবাসে।

কিছু কাল যায়। নওফেল বাদশা শিকারে গেছে। তার দেখা হল মজনুর সঙ্গে। তার দুঃখকাহিনী শুনে বাদশা লায়লির সঙ্গে মজনুকে বিয়ে দেওয়াবে ঠিক করলে এবং লায়লির বাপকে চিঠি লিখে দূত পাঠালে মজনুর সঙ্গে তার মেয়ের সম্বন্ধ করে। লায়লির বাপ রাজি হল না পাগলের হাতে মেয়েকে দিতে। তখন বাদশা সসৈন্যে গিয়ে যুদ্ধ করে সওদাগরকে পরাজিত করলে। বাদশার অনুচরেরা লায়লিকে এনে হাজির করলে বাদশার শিবিরে। সেখানে মজনুও ছিল। লায়লিকে দেখে বাদশার মাথা ঘুরে গেল। মনে মনে এঁটে রাখলে

মারিয়া মজনুরে তরে ইহাকে লইয়া
আপনার ঘরে আমি যাইব চলিয়া।

মজনুর সঙ্গে লায়লির সাদী উপলক্ষ্যে বাদশা সকলকে সরবৎ দিতে বললে। মজনুর পেয়ালায় বিষ দেওয়া ছিল, সেই পেয়ালা ভুলে বাদশা পান করে মারা গেল।. এবারেও কন্যা পাত্রস্থ হবার আগে লগ্ন ভেঙে গেল। মজনু ও লায়লি দুজনে বনেই রইল, কিন্তু কে কোথায় আছে জানে না। মজনু বনশোভায় প্রিয়ার সৌন্দর্য খুঁজে বেড়াতে লাগল। কবি বলছেন

আশক-মাশুক প্রেম বলে যার তরে
মজনু হৈতে শেষ হইল দুনিয়া ভিতরে।

বাদশার মৃত্যুর খবর পেয়ে সওদাগর লায়লিকে বন থেকে ঘরে নিয়ে যেতে এল। ফেরবার পথে লায়লির উট দলছাড়া হয়ে ঘুরে ঘুরে শেষে মজনুর কাছে পৌঁছল। লায়লি মজনুকে চিনতে পারল না। পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে মজনু বললে, আমার নাম কয়েস,

কোথা মোর ঘরবাড়ী নাহি হয় দিশা
লায়লিকে সঁপিয়া প্রাণ বনে হৈল বাসা।

শুনে লায়লি মূর্ছিত হল। সুস্থ হয়ে সে বললে

আমার দুঃখের নিশি হল আজি শেষ
মোর দায়ে নিলে তুমি উদাসীর বেশ।
দেশ ছাড়ি ফের তুমি জঙ্গল ভিতরে
তাহার মজুরি আজ দিল বিধি তোরে।
দোহেতে পিয়াসা আছি জন্মকালাবধি
জীয়ন্ত-কুণ্ডের পানী পাঠাইল বিধি।
মন সুখে খাও নাথ দের কর কেনে
নামিয়া প্রেমের ঘাটে খুশি হয়ে মনে।
সৌরভ কমলকলি উঠিল ফুটিয়া
মনসুখে মধু খাও ভ্রমর হইয়া।
তোমার যে বস্তু আমি সুপিনু হে তুঝে
মনে যাহা ভাল কয় কর বুঝে শুঝে।

মজনুর প্রেম দেহবাসনার উপরে উঠে গেছে। সে লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করে বললে

শুন ধনী গুণমণি মোর প্রাণপ্রিয়া
দেখিয়া তোমার মুখ জুড়াইল হিয়া।

তব প্রেমে বিধি মুঝে করিয়াছে রত
সব ছাড়ি তেরা আশে হইয়াছি হত।
মোর মন শান্ত তব মধুর বচনে
শুন প্রিয়া এই ভাল রেখ খালি মনে।
আমারে লজ্জিত নাহি কর এ কামেতে
আখেরেতে সোনাগার কলঙ্ক জগতে।

তারপর লায়লিকে উটে চড়িয়ে উটের লাগাম ধরে পৌঁছে দিলে সওদাগরের দলে।

ঘরে এসে লায়লির বিরহব্যথা আর বাধ মানে না। তবে তার দেহ আর বেশি দিন টিকল না। মরবার আগে মাকে এই অনুরোধ করে গেল,

আমার মওত বাদে মজনুর লাগিয়া
মোর এই সমাচার দিবে গো যাইয়া।
কহিবে মরিল লায়লি প্রেয়সী তোমার
যার তরে ছিলে তুমি অন্তরে বেমার।

লায়লির মা নিজে বনে গিয়ে খবর দিলে মজনুকে। শুনে মজনু ধূলায় লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। তবে তার দুঃখদিনও শেষ হয়ে এল।

মালেকল মওত সেথা পৌঁছিল আসিয়া
মজনুর পাক জান নিল নেকালিয়া।

বনের পশুরা তার প্রাণহীন দেহ আগলে বসে রইল। পশুদের এই আচরণ জঙ্গলে আগন্তুকের চোখে পড়ল। সে লোকজন ডেকে মজনুর দেহ নিয়মমত সমাধিস্থ করলে। কাহিনী শেষ হল।

দৌলৎ উজির বহরামের কাব্য ছাপা হয়নি। প্রাপ্তপুথির লিপিকাল ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ। রচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর বলে মনে হয়। এইটিই বোধ করি বাংলায় লয়লা মজনুর সর্বোৎকৃষ্ট অনুবাদ। কবির গুরু ছিলেন পীর আছাওদ্দীন শাহা। পিতা মোবারক খান ছিলেন "চাটিগ্রাম-অধিপতি" নিজাম শাহা সুরের "দৌলৎ উজীর"।

ফিরদৌসীর শাহ নামার অনুবাদ করেছিলেন মহম্মদ খাতের ঢাকা (?) জেলার গড়পাড়া নিবাসী তাজদ্দিন মহম্মদের অনুরোধে। কাব্যটি বিশালকায়, টানা লাইনে

ছাপা সাড়ে তিন শ পাতা কোয়ার্টো। তাজদ্দিন মহম্মদ বইটি ছাপিয়েছিলেন। কবির কথায় প্রকাশক তাঁকে এই অনুরোধ করেছিলেন,

শাহানামা কেতাবেতে রোস্তমের বাত
নানারূপ জঙ্গ তাতে আছে ভাতে ভাত।
দেহ সে কেতাব তুমি রচনা করিয়া
আমি তাহা জাহের করিব ছাপাইয়া।

শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জলিখা' ১৩৯৮ হইতে ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে (অর্থাৎ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজ্যকালে) রচিত হয়েছিল বলে ডক্টর এনামুল হক মনে করেন।[1] পুথিতে আছে

তিরতিএ প্রণাম করোঁ রাজ্যক ঈশ্বর
বাঘে ছাগে[2] পানি খাএ নিভয় নিডর।
রাজরাজেশ্বর মৈদ্ধে ধার্ম্মিক পণ্ডিত
দেব অবতার সেহো জগত বিদিত।
মনুষ্যের মধ্যে ধর্ম-অবতার
মহা[3] নরপতি গ্যেছ পৃথিবীর সার।
ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজা আপন বিজএ
পুত্র শিষ্য[4] হস্তে তিহঁ মাগে পরাজএ।
মহাজন[5] বাক্য ইহ পূরণ করিয়া
লইলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল-গৌড়িয়া।

ডক্টর হক "গ্যেছ" "গিয়াস"-এর কথ্যরূপ ধরে তাঁর সিদ্ধান্ত করেছেন। কিভাবে "গিয়াস" "গ্যেছ" হয়েছে তার কোন নির্দেশ তিনি দেন নি। একথা ছেড়ে দিলেও বইটি যে অত পুরানো তার কোন প্রমাণ তিনি উপস্থাপিত করেন নি। সুতরাং শাহ মুহম্মদ সগীরের গ্রন্থ যে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা তা উপস্থাপিত উপাদান থেকে স্বীকার করা যায় না। উপরের বর্ণনাটি যে কবির পোষ্টা রাজার সে বিষয়েও দারুণ সন্দেহ জাগে। আল্লাহ্ ও হজরত মুহম্মদের পর যে কবি রাজাকে বন্দনা করবেন, নিজের মুরশিদকে না করে, তাও সম্ভবমনে হয় না।

[1] সাহিত্য-পত্রিকা দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৭১ সাল দ্রষ্টব্য। [2] পাঠ "ছাগে"। [3] পাঠ "মোহা"। [4] পাঠ "সিস্থ"। [5] পাঠ "মোহাজন"।

১৪

উনবিংশ শতাব্দী

পুরানো রোমান্টিক গল্পকাহিনীর আদর খুব বেড়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। এই সময়ের রচনা প্রায় সবই পদ্যে। বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান, তুতিনামা (বা শুকসপ্ততি), সখীসোনার কাহিনী, এবং হাতেমতাই, ইউসুফ-জেলেখা, গোলে-বকৎেলি, গোলে-হরমুজ ইত্যাদি গল্প হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শ্রোতা-পাঠকদের প্রিয় ছিল। ইংরেজী থেকে হিন্দু লেখকেরা পদ্যে অনুবাদ করলেন 'পারস্য ইতিহাস,' 'তুরকীয় ইতিহাস,' কামারল্‌-জমানের কাহিনী ইত্যাদি, আর গদ্যে তর্জমা করলেন 'আরব্য উপন্যাস' ও 'পারস্য উপন্যাস'। ইসলামি রোমান্টিক কাহিনী হিন্দুরাও খুব আগ্রহ করে পড়ত। তাই এঁরা পদ্যে লয়লী-মজনু, ইসুফ-জেলেখা, মীর হসনের মসনবি ইত্যাদি এবং গদ্যে শাহানামা, হাতেম তাই, চাহার দরবেশ, সেকান্দরনামা ইত্যাদি লিখেছিলেন। আরব্য-উপন্যাসের পদ্য অনুবাদ হয়েছিল উর্দু থেকে, তাই বইটির আরবী নাম 'আলেফ লায়লা' বজায় ছিল।

আলেফ-লায়লার দুটি পদ্যানুবাদ মিলেছে। একটি রোশন আলীর (১৮৮৬), অপরটি সৈয়দ নাসের আলী, হবিবল হোসেন ও আয়জদ্দিন আহাম্মদের কৃত এবং কাজী সফীউদ্দীন কর্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত (সম্পূর্ণ সংস্করণ ১৩০৮)। নাসের আলীর নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলায় ভৈটা গ্রামে। কবি তাঁর পরিচয় যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবেই দিয়েছেন। মুর্শিদ ও ওস্তাদদের সম্বন্ধে লিখেছেন এই কথা.

মুর্শিদের কদম ধরি কহে নাছের আলি
সাহা জেয়াওদ্দি নাম আল্লার সে ওালি।
এছলামি দীনেতে মুঝে করিল তালকিন
বাতাইল এ রৌশন মহাম্মদি দীন।
ওস্তাদের নাম মেরা গোলাম পাঞ্জাতন
বিদ্যাবান্‌ দীনদারি না দেখি এমন।

ছৈএদ জাতের বিচে আওলাদ রছুল
এলাহি করেন তাঁর মকছেদ হছুল।
সৃষ্টিদাস লেখাইল বাঙ্গালা এলেমে
জাতিয়ে কাএস্ত তিনি জাহের আলমেঁ।
এই দুই জন মোর ওস্তাদ মিলিয়া
আখি-দান করে দিল রাহা দেখাইয়া।
তাহাতে পাইনু আমি সব অন্বেষণ
হামেসা তাঁদের সুখে রাখ নিরাঞ্জন।
হীন নাছের আলি বলে ভজ মন খোদা
আজহার আলি বাপ মোর গেয়াছদ্দি দাদা।
হোছেনী আওলাদ মোরা ছৈএদের জাত
ওম্মেদ কি বল রাখি নবির সাফাত।

নাসের আলি আলেফ-লায়লার প্রথম খণ্ড ("পহেলা দপ্তর") লেখা শেষ করেছিলেন ১২৭১ সালের ১৫ই ভাদ্র মঙ্গলবার তারিখে।

বইটিতে নাসের আলি অনেক ভাল গান দিয়েছেন বিশুদ্ধ বাংলায়, হিন্দী-বাংলা মিশ্র ভাষায়, এবং বিশুদ্ধ হিন্দীতে। যেমন,

রাগিণী খাম্বাজ তাল আর্দ্ধা
জুড়াইল প্রাণ মোর তব মুখের শুনে বাণী
কালোরূপে কিবা ক্ষতি যে বা হয় গুণমণি।
প্রকাশিয়া অঙ্গ কালো অন্তর তোমার আলো
কালো মেঘের ভিতরেতে থাকে যেমন সৌদামিনী।
কোকিলের রূপ বিনে দুঃখ কিছু নাহি জেনে
মোহিত [হয়] সকলে শুনিয়া [সু] রব ধ্বনি।
কালো রূপ কৃষ্ণ সার রাধা প্রেমে মজে তার
পাপী পায় পাপে মুক্ত সে নামারে মনে গুণি।
কালীর কালো বরনে মহাদেব সারা প্রাণে
জটাধারী হৈল তায় নাছের আলি কহে শুনি॥

রাগিণী বসন্ত তাল পোস্তা

দেলকো গার তু করনে চাহে তাহারি সঙ্গে মিলন
বস্তনত ছাফা করো পাবে অমূল্য রতন।
ছেএবাল করো দেলকো আপনা তারীকিছে তরকে রহনা
ঘরেতে পাবে তারে কি লাভ ভ্রমে কানন।
খোদ জো বাছে দিয়া একবার জেছকা হায় দিদারকে দরকার
গুরুপদ ধরিয়া সে প্রথমে করো সেবন।
নাছের আলি রোরকর খুজারি দিদা উপর
প্রিয়ায় না পায় তবু বিনে গুরুর সাধন॥

রাগিণী বেহাগ তাল পোস্তা

এস্কি আতসছে দেল জলকে কাবাব হুয়া
ছবর তহ্‌কিন ছারা জিছে মেরা গেয়া।
রাতকো না পাঞে চেতন বেস্তার পর ছোনেছে
এস্তেজারিমে নিন্দ আঁখোছে গম হুয়া।
ছোজ দেলছে জালতা হ্যায় তন বদন ছারা
চসমোঁ কি আছুছে রুদ নীল বহ গেয়া।
খুন জেগর পিতা হোঁ মেয় কে জায় পর
হর রগে হারতার মেরা চঙ্গবন গেয়া।
ছাদার নেকালতা হ্যায় মুছে এয়ার এয়ার বোল
জুজ বেছালে জানা আজ জা তন জুদা হুয়া।
দম বদম রকছ কারে ছামনে ফেরাক
নাছের আলি দেখ কর বেহুস রহ গেয়া॥

মুসলমান রোমান্টিক কবিদের মধ্যে অনেকেই যে সুফী মতাবলম্বী ছিলেন তার পরিচয় উঁহাদের লেখার মধ্যেই মিলছে। কারো কারো রচনায় সুফী ভাবের শুধু ইঙ্গিত নেই স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বর্দ্ধমান শহরে বাহির-সর্ব্বমঙ্গলা নিবাসী সমসুদ্দীন সিদ্দিকি খোনকার 'ভাবলাভ' (১৮৫৩) নামে বই লিখেছিলেন। তাতে দুটি রূপক প্রণয়কাহিনী আছে—ভাবলাভ ও শুরতজান (দেলারামের কাহিনী)। বইয়ের শেষে কবি পিতার যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় এঁদের বংশের সুফীধারা।

রাজধানী বর্দ্ধমান তন্মধ্যে বাসস্থান
বারি-সর্ব্বমঙ্গলাতে ঘর
ছিদ্দিকি পদ্ধতি ধরে খোন্দকারি প্রেসা করে
গোলাম ফরিদ খোন্দকার।
দেশখ্যাত নাম যার কি লিখিব গুণ তার
কেবা নাহি জানে চেনে তারে
এলেমে আলম তিনি ফকিরের চূড়ামণি
প্রকাশিত বাঙ্গাল ভিতরে।
তত্ত্বজ্ঞানী বঁধূ যাঁরা দিবানিশি আসি তারা
সেবা করে তাহার চরণে
হৃদয়ের রাজা যিনি তাঁহারে সাধনে চিনি
ফকির হইল কত জনে।
শুন সবে সমাচার আমি মূর্খ পুত্র তাঁর
আর দুই ভ্রাতা আছে যাঁরা
তাঁহারা মৌলুবি হয়ে ভবভাব তেয়াগিয়ে
প্রভুভাবে ভাবি হৈল তাঁরা।
উদয় ভাবের ভাব পুথি করি ভাবলাভ
ভাবির ভাবের জন্যে করে
দেহ দেল লয়ে জানে হৈল পুথি শুরতজানে
দেখ বুঝে আপন অন্তরে।
তিন বন্ধু একস্তরে আদম আর পয়গম্বরে
নিজে প্রভু নৈরাকার যিনি
কফ পিত্তি বায়ু মত তিনজন ধরে রীত
একটা মূর্ত্তি দেহ হৈল শুনি।
তিন তিনে নয় হৈল গোপনে গোপন রৈল
ভাবি লোক করহ গোপন
নয় ভিন্ন নয় আর নয় মধ্যে নৈরাকার
নয় ছাড়া নয় সে বিধান।...

ভাবলাভে অনেকগুলি গান আছে, বাংলায়, হিন্দীতে, বাংলা-হিন্দীতে। শেষে কয়েকটি আধ্যাত্মিক গান আছে "শ্রীসমছদ্দিন বৈরাগীর"। এর একটি উদ্ধৃত করছি। গতানুগতিক ভাবের হলেও গানটি চমৎকার।

আমি জেনেছি তোমারে
তুমি তো জীবন হয়ে থাক কলেবরে।
তব ক্ষমতায় চলি তব বলায় আমি বলি
তব খেলাতে যে খেলি ভব পারাবারে।
তোমার ক্ষমতা যত কি লিখিব রীতনীত
সকলের পরিবর্ত্ত আছয়ে অন্তরে।
শয়নে স্বপনে থাকি গোপনে নয়নে দেখি
তুমি সে বনের পাখি না থাক পিঞ্জরে॥

"হিন্দি ভাঙ্গি বঙ্গভাষা" করে 'গোলে বকাওলি' লিখেছিলেন এবাদত আলী (বা এবাদতুল্লা)। পিতামহ চাঁদ-খাঁ মুনশি, জ্যেষ্ঠতাত আফতাবুদ্দীন, পিতা বসিরুদ্দীন। এবাদতের নিবাস ছিল মীর্জাপুরে, "পিতা বছিরদ্দিনের জন্ম ঢাকার জেলায়"। মৃগাবতীর কাহিনী নিয়ে এবাদত বিশুদ্ধ সাধুভাষায় একটি গীতপ্রধান কাব্য লিখেছিলেন (রচনা ১২৫২ সাল, ছাপা ১৮৫৭ খ্রী) 'কুরঙ্গভানু' নামে।

দ্বাদশ সও বায়ান্ন সালের রচনা
চৌষট্টি সালেতে ছাপি ছিল না বাসনা।

ফারসী থেকে লেখা হয়েছিল কুমারহট্ট-নিবাসী উমাচরণ মিত্রের ও বেযোড়া নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের 'গোলে বকাঅলি ইতিহাস'। বইটি প্রথম ছাপা হয়েছিল শ্রীরামপুরে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে।

মানিক মিঞা (ওরফে আবদুশ শুকুর)-ও গোলে বকাওলি রচনা করেছিলেন। এনায়েতুল্লাহ-এর ফারসী রচনা অবলম্বনে ফরিদপুর জেলায় আলগিচর গ্রাম নিবাসী মহাম্মদ মিরন 'বাহার দানেস' লিখেছিলেন ১২৪৪ সালে। বইটি ছাপা হয়েছিল অনতিবিলম্বে। দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১২৫২ সালে। যে সব আত্মীয় বন্ধু কবিকে উৎসাহিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন হিন্দু—ঢাকা নিবাসী গঙ্গাধর চন্দ্র রায় এবং কলিকাতা পদ্মপুকুর নিবাসী "মহাকবি" হারানন্দ পরামানিক। অপর ব্যক্তি হচ্ছেন কবির স্বগ্রাম-বাসী মুনশি মহবৎউল্লা,

কোতয়াল বরকতুল্লা, ফুঁরফুরা নিবাসী গুরু মুনশি গোলাম আব্বস, ভ্রাতা আলী আহমদ, বলিয়ার খাঁ, ছলিম ও নুর বকশ। রচনায় সাহায্য করেছিলেন ভাই মুনশি মতিউল্লা। কবি এক জায়গায় লিখেছেন,

মুনশি মতিউল্লা ভাই তার বলিহারি যাই
গুণে গুণবন্ত মাহাশয়
আমার লিখায় ধরি কৈল কত কারিগরি
মহম্মদ মিরনে সত্য কয়।

মিরনের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন সেকালের বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ ও ঠগী-দলন দারোগা বরকতুল্লা (চলতি কথায় বাকাউল্লা)। এঁর সম্বন্ধে মিরন লিখেছেন

কুলে শীলে মান্যমান গুণে অনুপাম
শ্রীযুত কোতওাল বরকতুল্লা নাম।
ধনে কিছু মন্দ নহে রূপেতে তৎপর
বুদ্ধে বৃহস্পতি তুল্য গুণে গুণাকর।
ধর্মেতে ধার্মিক অতি যুধিষ্ঠির-মতি
সাহসে অধিক যেন ভীম যোদ্ধাপতি।
ক্ষমতা হইতে বেশি দানের সুখ্যাত
শ্রবণে শুনিলে কর্ণ কর্ণে দিবে হাত।...
কোম্পানির কর্ম্ম তিনি করেন বহুকাল
পশ্চিমেতে মৃজাপুরে ছিলেন কোতয়াল।
সে কর্ম্মে সুখ্যাতি অতি সর্ব্বলোকে বলে
কত দস্যু তস্কর ধরিল কলে বলে।
তৎপরে কালনাগঞ্জে করে সেই কাম
অদ্যাপি সকলে ঘোষে সুখ্যাতির নাম।
বাখান লিখিলে বাড়ে পুস্তক তাহায়
প্রকৃত লিখিনু যাহা চক্ষে দেখা যায়।
অধিক বাসনা তারো আমার উপরে
সহোদর হৈতে বড় ভালবাসে মোরে।
আমি ধনহীন হই তিনি ধনবান
নিজ ধন দিয়া মোর বাড়ায় সম্মান।

কাজী সফীউদ্দীন পরে দ্বারকানাথ রায়কে দিয়ে বাহার-দানেশ অনুবাদ করিয়েছিলেন।

'তমিম গোলাল চতুর্থ ছিল্লাল' কাব্য মোহম্মদ রাজার রচনা। মধ্যে মধ্যে প্রকাশক হামিদুল্লার ভনিতা আছে। শেষে হামিদুল্লার একটু পরিচয় আছে,—পিতা মহাম্মদ কাজেম, নিবাস চাটিগাঁ। বইটি ১২৭১ সালে ছাপা হয়েছিল। কাহিনী রূপকথা-জাতীয় রোমান্স।

'গোলে দেও গান্ধার পুঁথি' শেখ দাএমল্লার রচনা (১২৬০)। দাএমল্লার পিতা মহম্মদ ফকীর, পিতামহ মহম্মদ লেয়াজি "হামেসা ছিলেন পাহালওানির কামেতে"। পৈতৃক নিবাস দক্ষিণরাঢ়ে আকনি মৌজায়।

১৫

ভুরশুট থেকে বালেশ্বর

উড়িষ্যায় বালেশ্বর নিবাসী আবদুল মজিদ খাঁ ভূঞা তাঁর 'রঙ্গবাহার' কাব্যে সৈয়দ হামজাকে কাব্যগুরু বলে বন্দনা করেছেন

কবিতা করিনু শুরু সেই সে আমার গুরু
মোলাকাত নাহি মেরা সাথে
তার ধ্যান মনে রাখি কেতাবে ছেফত দেখি
হাতেম তাইর কেচ্ছা হৈতে।
আল্লা তালা তার তরে বেহেস্ত নসিব করে
ওফাৎ হৈয়াছে বহুকাল
এয়সা কেহ বাঙ্গালার শায়ের না করে আর
যব তক দুনিয়া বাহাল।

হামজার হাতেম-তাই পড়তে পড়তে আবদুল মজিদের মনে কাব্যরচনার প্রেরণা জেগেছিল। সেদিন ৩রা বৈশাখ শনিবার ১২৬৮ সাল। কবি লিখেছেন

রোজ আজ শনিবার তারিখ শুমার তার
বৈশাখ মাসের তিন দিন
করিনু আগাজ কেচ্ছা সন তারিখ দিন আচ্ছা
বার শও আটষট্টি একিন।
একদিন খুসি হৈয়া হাতেমের কেচ্ছা লিয়া
পড়িতে আছিনু বাঙ্গালাতে
শুনিবারে লোক কত বসেছিল শত শত
মেরা জমিদারি কাছারিতে।

এঁদের অনেকেই তরুণ ভূস্বামীকে সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করলেন। তার মধ্যে প্রধান তিনজন—ফতেউল্লা খান, আবদুল আলী ও আমীর আলী।

মজিদ লিখছেন

এই তিন জন মোরে কহিলেন এ খাতিরে
কর কিছু কেচ্ছা বাঙ্গালাতে
তোমার যে নাম হবে দেশে দেশে কেচ্ছা যাবে
এই যে লাড়কাই উম্মরেতে।
লাড়কাই ওম্মর মেরা না জানি কবিতা ধারা
গণনাতে বাইশ বৎসর
ছৈএদ হামজা গুরু তার নামে করি শুরু
সেই হাতি আমি যে মচ্ছর।

আবদুল মজিদ ছিলেন বাদশাহী আমলের জমিদার-বংশের ছেলে। নিবাস উড়িষ্যায় বালেশ্বর জেলায় গড় পদ্মা পরগনায়। সাত পুরুষ আগে কবিরা ছিলেন হিন্দু, বামুন। আবদুল মজিদের পিতা ও তাঁর দুই ভাই পুলিশের দারোগা ছিলেন। হামজাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার পর কবি হিম্মত-খাঁ শহীদ পীরকে বন্দনা করে আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

আর যে বন্দিনু আমি হেম্মত-খাঁ সহিদ নামি
বড় জবরদস্ত সেই পীর
সদাই ভরসা রাখি তাতে আমি করি সেখি
হামেহাল পীর দস্তগীর।
জহুরা বড়ই তার বাঘ-পিঠে সে সওয়ার
হৈয়া ফেরে রাত নিশি কালে
হইলে জুম্মার সাম এসে করে যে সালাম
ফের চলে যায়েন জঙ্গলে।
তাহার রওজা আছে গর পদ্মা পরগনা বিচে
মেরা বাটি হৈতে থোড়া দূর
আড়ে দীগে বোল বাটি মাপিয়া হয়েছে খাটি
নিকটেতে বিদ্যাধর-পুকুর।
গড় পদ্মা পরগনা ছাড়া জমিদারি আছে মেরা
আর হিস্বাদারি আছে তাতে

বাদশাই আমল কালে এই জমিদারি মেলে
তিন শও বছর হইতে।
পূর্ব্বেতে বামন ছিনু হালে মোছলমান হৈনু
মোহাম্মদি দীনের কারণ
সাত পোস্ত হৈল মেরা চাল মোছলমানি ধারা
কুফরানি হৈয়াছে বারণ।
মজহাব আমার শোন ইমাম আজম জান
কওম মেরা ছিদ্দিক পাঠান
খেতাব আমার ভূঞা কেহ কহে বাবু মিঞা
দাদা মেরা ছাদতুল্লা খান।
কেফায়েত খান তার আছমতুল্লা খান আর
রহমতুল্লা খান তিন বেটা
সব হৈতে বড় পহেলা যে মধ্যম সে মাজেলা
তেছরা সে সব হৈতে ছোটা।
ইংরাজের আমলেতে এই তিন দারগিতে
পুলিশ থানাতে মকর্ব্বর
বাহাল হইল সবে নিকটে সাহেব যবে
এথানে আছিল মাজিষ্টর।...
দোন চাচা ছালামত বাপ মেরা সে ফওত
হৈয়া গেছে সাত সাল হৈল...
বাপ আর দোন চাচা খছলত আদত আচ্ছা
নেকি ছাড়া নাহি করে বদি
সরকারের খয়ের যাহা হাকিমের স্থানে তাহা
এলাহি রহম করে যদি।
মেরা ভি সরকার বিচে বহু নেকনারি আছে
খোসনামি পাইনু বহুত
ফারসী উড়িয়া বঙ্গ ইংরাজি নাগরি সঙ্গ
লেখাপড়া নাহিক তাকত।

লাইনের সমারিতে পড়া নাই এলেমেতে
আটাতে নেমক জেয়দা হয়
থোড়া থোড়া পড়ি গুনি কেতাব কোরান শুনি
তবে মুক্ত জানিবে নিশ্চয়।

রচনা কতকদূর এগোবার পর কবি পড়লেন রেভিনিউ সার্ভের ও নব প্রবর্তিত ইন্‌কম্ ট্যাক্সের কবলে। লেখা বন্ধ রইল কিছু কাল। কবি লিখছেন

বালেশ্বর বিচে গড় পদ্মা পরগনা
ভিক্টরিয়া শাহাজাদী যার মালিকানা।
লেয়সন করোসন দুই লাট বন্দি
খাজনা দাখিল করি মোরা হাত বান্দি।
জরিপেতে বন্দবস্ত হইয়াছে যার
বহুত মস্কেলে দিতে হবে রাজকর।
তাহাতে যা হৌক করি দুঃখেতে গোজরান
এইরূপে দিনপাত চালায় রহমান।
রাতদিন দোয়া করি মহারানীর তরে
রাজ্যবৃদ্ধি হয় তার খোদাতালা করে।
এমন আমল ভুকা না হয় জাহানে
এক জাগায় রাখে বাঘ বকরি দুইজনে।
কেহ কাজে জবরদস্তি করিতে না পারে
কায়েম হুকুম যে আইন অনুসারে।
এই মতে কতদিন যায় গোজরিয়া
পালেন সবার তরে মেহের করিয়া।
তাহাতে আইল এক এমন রাক্ষস
তাহার বিখ্যাত নাম এনকাম টেকস।
লেএসন টেক্‌স কহে তার বড় ভাই
হইল মসহুর নাম জানেন সবাই।
এনকাম রাক্ষস [আর] লেয়সন তম্‌প
এই দোন মিলিয়া করিল ভূমিকংপ।

দেশে দেশে আইল তার হুকুম পরওানা
রসদ দাখিল কর দোহারা খাজানা
প্রজাগণ যেবা ছিল গরীব নামদার
দিলেন রসদ হৈয়া হুকুম-বরদার।
যত দেয় তত হয় রসদ তামাম
তবু না হইল তার খাবার আঞ্জাম।
তাহার খরচ কি মানুষে দিতে পারে
যত দেয় তবু না তাহার পেট ভরে।
ভেবে দেখি মনে যদি এইমতে খাবে
তামাম মানুষে খেলে পেট না ভরিবে।
এইরূপে যদি সে করে কারবার
থোড়া দিনে জান রাখা হইবেক ভার।
মাসিকানা মতে তবে হিসাব করিয়া
পেয়াদা রসদ নিতে পৌছিল আসিয়া।
আমি যদি শুনিনু তাহার সমাচার
হুকুমের মত করি রসদ তৈয়ার।
যদি আমি রসদ হাজির নাহি করি
গ্রাস করিয়া লিবে মোর জমিদারি।
যাহা দিয়াছেন আল্লা সোকর হাজার
বাহাল রাখেন তারে করিয়া আমার।
সেই ডরে রসদ যে করিনু আঞ্জাম
বন্ধ করে দিনু আমি সাইরির কাম।
কত ছন্দেবন্দে তার আঞ্জাম করিয়া
কবিতা করিনু শুরু এলাহি ভাবিয়া।

রঙ্গবাহারের রচনা শেষ হল ১২৭০ সালের আষাঢ় মাসে, রচনারম্ভের দুবছর দশ দিন পরে। কবি বলেছেন, "ইদে কেচ্ছা শুরু কৈনু বকরিদে খতম দিনু হেসাব দু সাল দশ দিন"। একে তো কাব্যরচনা দুর্ঘট, তায় ইসলামি বাংলায় এবং সর্বোপরি উড়িষ্যা-নিবাসী তরুণ লেখকের পক্ষে। তাই গ্রন্থশেষে বলেছেন

শুন সব ভাইগণ মেরা এই নিবেদন
সামান্য না জান কবি করা
মনে খুব বুঝি বুঝি কাফিয়ার মিল খুজি
তবে এক পদ হয় পূরা।
কাফিয়াতে ছুটে গেলে যতক্ষণ নাহি মেলে
ততক্ষণ কেয়ছা হয় জান
কবিতা করেন যেই জানিতে পারেন সেই
দুখ-সুখ যতেক নিদান।
তাহাতে লাড়কাই [বেলা] ভালবাসা কোদাই খেলা
আর ছিল লেখাপড়া খুব
খেলি কি এহারে লিখি সওক হইয়াছে দেখি
তাহাতে লিখিনু করে হুব।
শুদ্ধ এ বাঙ্গালা নয় হিন্দি বি মিশেছে তায়
এ কারণে পদ বেশি-কমি
তাতে ফের এখানেতে চাল নাহি বাঙ্গালাতে
উড়িষ্যা-নিবাসী আছি আমি।
উড়িষ্যা দেশেতে বড়া উড়িয়া জবান কড়া
উড়িষ্যাতে সব কারখানা
বাঙ্গালী এ দেশে নাই যদি খুজে খুজে পাই
সাথ বিচে দুই এক জনা।...
ফারসীতে হাফেজ-আলি হেছামদ্দিন যে বাঙ্গালী
আছে দোন এলেমের কামিল
তাহার নিকটে গেনু এই পুথি দেখাইনু
দেখে খুশি তাহাদের দিল।

ফারসী সাহিত্যবিদ্ হাফেজ আলীর ও বাংলা-বিশারদ হেসামুদ্দীনের অনুমোদন ও প্রশংসা পেয়ে লেখক বই ছাপাতে এলেন কলিকাতায়। যেহেতু

শুনিতে পাইনু আমি বড়া বড়া আছে নামি
কলিকাতা সহর ভিতর

মেরা বাড়ি হৈতে ভাই দশ্বা রোজ রাহা সেই
কিছু পূর্ব্ব কিছু উত্তর।

প্রকাশক মুনসি গোলাম মওলা

এ সায়ের বিমারিরে দেখিয়া নজরে,
চিনিয়া কামেল দাওা দিলেন তাহারে।

এবং ১২৭১ সালে রঙ্গবাহার ছাপা হল।

রঙ্গবাহারের কাহিনীর প্রতিষ্ঠা চলিত রূপকথার উপর। মিশর দেশের রাজা ও উজীরের এক সঙ্গে পুত্রলাভ হল। রাজপুত্রের নাম শাহা আলম, উজীরপুত্রের নাম মাহা আলম। দুজনের মধ্যে নিবিড় প্রণয়। বালক বয়সে দুইজনেরই বিয়ে হল, যথাক্রমে "কেন্নওজ" অর্থাৎ কনৌজ দেশের রাজকন্যার ও উজীরকন্যার সঙ্গে। রাজকন্যার নাম নয়নভানু ("নয়নবানো") উজীরকন্যার নাম চাহনভানু (চায়েনবানো")। বিয়ের পর কন্যারা বাপের বাড়ীতেই রইল নিতান্ত নাবালক বলে। কুমারদের বয়স ষোল বছর হলে এক দিন তারা লুকিয়ে শ্বশুরবাড়ী গেল। দু-বন্ধুর এমন প্রণয় যে রাত্রিতেও কাছছাড়া হতে চায় না। উজীরপুত্র রাজপুত্রের ঘরেই রইল। পর্দার আড়ালে রাজপুত্র শুয়ে রইল প্রত্নীর অপেক্ষায়। রাজকন্যা যখন এল তখন রাজপুত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। রাজকন্যা স্বামীকে গাঢ়নিদ্রামগ্ন দেখে সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরল। সাত দেউড়ী পেরিয়ে রাজকন্যা বাহিরে এল। দুজন চোর এসেছিল রাজবাড়িতে চুরি করতে। তারা কৌতূহলী হয়ে চুপি চুপি তার পিছু নিলে। ঘুরে ঘুরে রাজকন্যা এল তার প্রণয়ী যোগীরকুটিরে। যোগী তাকে দেখেই ভর্ৎসনা শুরু করলে দেরি হল বলে। রাজকন্যা দোহাই দিলে স্বামী-আগমনের। যোগী তখন তার হাতে খাঁড়া দিয়ে বললে, যাও স্বামীকে কেটে এস। রাজকন্যা ঘরে এসে স্বামীর মাথা কাটলে, তারপর

এক হাতে লয়ে শির আর হাতে খাঁড়া
চলিল যোগীর পানে আওরত বেদাড়া।

মন্ত্রী-পুত্র মাহ আলম জেগে ছিল। সে রাজকন্যাকে অনুসরণ করলে। রাজকন্যার কাণ্ড দেখে যোগী ক্রুদ্ধ হয়ে তার নাকে কামড় দিলে। অমনি মাহ আলম বসালে তলোয়ারের কোপ। রাজকন্যা বাড়ী ফিরে এসে রাজপুত্রের হত্যার জন্যে দায়ী

করলে মন্ত্রী-পুত্রকে। মন্ত্রী-পুত্র চুপ করে রইল। রাজা তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলে। তখন চোর দুজন এগিয়ে এসে রাজকন্যার কীর্তি ফাঁস করে দিল। মৃত যোগী মুখে রাজকন্যার নাসিকার অংশ পাওয়া গেল। রাজার হুকুমে রাজকন্যার জীবন্ত সমাধি হল। মাহ আলম বন্ধুর মৃতদেহ সিন্ধুকে নিয়ে রাজবাড়ী ছেড়ে চলল। পথে উজীর তাকে নিয়ে গেল মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্যে। মন্ত্রী-কন্যা ছিল ধার্মিক এবং গুণিন। খোওাজ খিজিরের মধ্যস্থতায় সে আল্লার কাছে দৈবশক্তি লাভ করেছিল।

এছম পড়িয়া বিবি তছবি জপে মনে
আওাজ গায়েব শোনে আপনার কানে।

মন্ত্রী-কন্যা রাজপুত্রকে বাঁচিয়ে দিলে। পত্নী ও বন্ধুকে নিয়ে মাহ আলম দেশে চলল জাহাজে চড়ে। পথে যানভঙ্গ হয়ে তারা পৌছল এক দ্বীপে। সেখানে এক বাগানে দেখলে এক অপূর্ব সুন্দরী নারীর প্রতিমূর্ত্তি। নীচে লেখা আছে এই কথা

এই যে টাপুর বিচে মহরম নগর আছে
সেইখানে আমার মোকাম
মেরা সাদী হয় নাই কবে হবে জানে সাঁই
ছুরাতেন্নেছা মোর নাম।
আমি যে বাদশার বেটী রূপে গুণে পরিপাটি
জান এই পিতল সমান
মূরত দেখিয়া মেরা অবাক হইবে যারা
মেরা পাশে আসিবে নিদান।

সুরতুন্নিসা নামের রাজকন্যা। পিতা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কহ কার কেছমতেতে খাও"। কন্যা উত্তর দিয়েছিল, "আমি খাই আপনা কেছমতে"। রাজা রাগ করে তাকে বনবাসে দিয়েছিল ধাইয়ের সঙ্গে। ধাইয়ের পরামর্শ শুনে রাজকন্যা বনে অগাধ ঐশ্বর্য লাভ করে মহরম রাজ্য স্থাপন করলে। বিয়ের বয়স হলে ধাইয়ের কথামত পিতলের মূর্ত্তি করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। যদি কেউ অসম সাহসী পাণিপ্রার্থী মহরমে পৌছত প্রাণ নিয়ে, তাকে পর পর তিনটি দুরূহ কাজের ভার দেওয়া হত। না পারলে প্রাণদণ্ড, পারলে সুরতুন্নিসার পাণিগ্রহণ। বলা বাহুল্য কেউই পারে নি।

রাজপুত্র শাহা আলম পিতল মূর্ত্তি দেখে পাগল হল। তখন তার হয়ে মাহ আলম গেল মহরমে এবং দুরূহ কাজগুলি সমাধা করে সুরতুন্নিসার সঙ্গে বন্ধুর বিয়ে দেওয়ালে। তারপর আরও কিছু বিপদ-আপদের পর দু বন্ধু দেশে ফিরে এল।

আমীর খুসরৌর ফারসী কাব্যের এবাদতুল্লা-কৃত উর্দু তরজমা অবলম্বনে আবদুল মজিদ খাঁ 'দেলরোবা চার চামান' লিখেছিলেন। চার বন্ধুর কাহিনী এটি। উপসংহারে কলিকাতার বর্ণনা আছে। একটি সমসাময়িক ঘটনা, স্পেন্সর-এর বেলুনে ওঠার ব্যাপারও কৌতুককর।

১৬

সের আলী

হুগলী জেলায় "চক সদত গ্রামখানি পরগনে বালিয়া" নিবাসী কবি সের আলীর 'তুতিনামা' বেশ ঝরঝরে লেখা। রচনাকাল "চন্দ্রপৃষ্ঠে পক্ষ আর সমুদ্রেতে নেত্র" (=১২৭৩) সাল। কবি ছিলেন সাধুপ্রকৃতি, গুরুভক্ত। বালিয়া পরগনায় বামনপাড়া গ্রাম-নিবাসী ফজলে হক খোন্দকার ছিলেন সের আলীর মুর্শিদ। গুরুতুল্য গুরুপুত্র আজিজ রহমানের অনুরোধে কাব্যটি লেখা হয়েছিল। গ্রন্থারম্ভে কবি বলেছেন

বালিয়া সামিল এক বামনপাড়া গ্রাম
তাহে বাস খোন্দকার ফজলে হক নাম।...
রূপগুণে মনোহর বিদ্যার সাগর
প্রভুপথে মন তাঁর আছে নিরন্তর।
তপে জপে ধ্যানে জ্ঞানে আছয়ে প্রচুর
তেজস্বী তপস্বী তিনি মারফতে জহুর।...
গুণাগুণ দেখি তাঁর এই দীনহীনে
বিক্রীত হইনু সেই গুরুর চরণে।
অতেব কারণ তার নিতান্ত বুঝিনু
মন-মরা দূর করি মুরিদ হইনু।
তার করে কর দিয়া মুদিয়া নয়ন
হৃদিমধ্যে দেখি যেন দীপ্ত নিরঞ্জন।
আর যাহা দেখি তাহা কহিবার নয়
কহিলে সে সরা কিছু অঙ্গহীন হয়।...
তার তুল্য পুত্র তার দিল ভগবান
রবি সম প্রকাশ নাম আজিজ রহমান।
তার যত গুণ তাহা লিখনে না যায়
পিতাপুত্রে সমতুল্য করিল খোদায়।

সরা তরা হকিকত মারফত জানি
বেদ্-পথে প্রবেশিল সেই গুণমণি।...
বুদ্ধে বৃহস্পতি তুল্য শুদ্ধ তার জ্ঞান
তিনি-হ দিলেন মোরে অনেক সন্ধান।...
তার আজ্ঞা অনুসারে রচনা করিনু
সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম কথা কহিতে নারিনু।...
সকলে প্রণাম ক্ষম প্রণাম জানিবে
আরম্ভ হইল কেচ্ছা বাঙ্গালার ভাবে।

অনেকগুলি গান আছে। গানে তোতাকে গুরু কল্পনা করে কাহিনীতে আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। একটি গান উদ্ধৃত করছি। এতে সের আলীর উদার গভীর অধ্যাত্মভাবের এবং রচনামাধুর্যের স্পষ্ট পরিচয় আছে।

তোমারে না দেখতে পেয়ে বাউরির মত হয়ে
জাতিকুল তেয়াগিএ মাতাপিতা বন্ধু দারা
গৃহকর্ম্মে সকল গেল তবু না মন সফল হল
এই কি মোর অদৃষ্টে ছিল না মানিল মন-ভ্রমরা।
মন-দুঃখ রৈল মনে নাহি পেলেম কোনখানে
তত্ত্ব করি স্থানে স্থানে দেহ মধ্যে আছে সারা
যদি কেহ দেখতে চাহ গুরুপদে মতি দেহ
গুরু বিনে অন্য কেহ কে দেখাবে জীবনতারা।
সের আলী রচিয়ে বলে গুরুপদে বিকাইলে
তবে গুরু তুলে কোলে দেখাইবে সারাৎসারা
নর-গুরু ফজলে হকে দেখাইয়া দিবে চোকে
তাহা বিনে কেবা আর দেখাইবে চন্দ্রতারা॥

১৭

উনবিংশ শতাব্দী (২)

"সাকিম ঢাকা হাল সারাফৎগঞ্জ" নিবাসী আবদুল রহমানের 'গমের দরিয়া'-য় কয়েকটি গান আছে সরল ভাষায়। কাব্যটির বিষয় আরব্য-উপন্যাসের মত রোমান্টিক ধরণের। বইটি প্রথমে লেখকই ছাপিয়েছিলেন। রচনার উপক্রম এইরকম,

> এলাহি আমার গোঞ্চা ওম্মেদের খোল
> আপনি বুলবুল হয়ে সাতে সাতে বোল।
> চিড়িয়া তবিয়ৎ মেরা করে দেহ তেজ
> উড়িয়া যাইতে যেয়ছা না হয় আজেজ।
> জবানকে কর মেরা নক্কর শিরিন
> এবারতে করে দেহ রঙ্গেতে রঙ্গীন।
> কাগজকে কর মেরা আস্মন কেসান
> কলমকে করে দেহ মেঘের সমান।
> গোলাব কারারা মেরা দোয়াতকে কর
> ছেয়াহি আতর আনি তার বিচে ধর।
> এখান হইতে কেচ্ছা করিলাম শুরু
> দোয়া কর আছ যত কবিতার গুরু।…

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে হিন্দী ও ফারসী থেকে অনূদিত এবং দেশি মৌলিক ছোট বড় বহু গল্পকাহিনী ছাপা হয়েছিল। তার বেশি ভাগ পদ্যে, কচিৎ গদ্যে-পদ্যে। এই বইগুলির অধিকাংশই একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। তাতে এগুলির জনপ্রিয়তা বোঝা যায়। আগে প্রধান প্রধান রচনার আলোচনা করেছি, পরেও দুচারটির করছি। সবগুলির আলোচনা প্রস্তুত গ্রন্থের পরিসরে আঁটবে না এবং তা অপরিহার্যও নয়। সুতরাং এইখানে শুধু লেখকের ও বইগুলির নাম করেই ক্ষান্ত হই। এঁদের মধ্যে লেখিকা পাই

একজন মাত্র, ফৈজুন্নেসা চৌধুরাণী। ইনি গদ্যে-পদ্যে একখানি বড় কাহিনী লিখেছিলেন। নাম 'রূপ জালাল'। বইটি ঢাকায় ছাপা হয়েছিল ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে।

আকবর আলী (ওরফে সৈয়দ মহম্মদ আকবর): জেবলু-মুলুক সামারোকের পুথি।

আজেহার আলী (হাওড়া-বালিয়া-ভাতহেড়ে নিবাসী): লজ্জাবতীর পুথি; দেলবর গোলে রওসন; জঙ্গে গুটিলা গাজির পুথি ও মানাথ রাজার লড়াই (রচনা ১৩০৪)।

আব্দুচ্ছোবহান (=আবদুল শোবহান); (বরিশাল-রামনগর নিবাসী): হাবিল-কাবিলের কেচ্ছা।[১]

আব্দুর রহিম (ময়মনসিংহ-গলাচিপা নিবাসী): দেল-দেওানা; নছিহতল খুবি; ছাখাওতনামা; বিলালনামা; এস্ক ছাদেখ; মল্লিকা আকার বিবির পুথি; রূপরাজ ও চন্দ্রাবতী কন্যার পুথি; গোল-রওসন বিবির পুথি; সেখ ফরিদের পুথি।

আবদুল আজিজ: দরবেশনামা।

আব্দুল গফুর (কাদিরখাল নিবাসী): শাহ বীরবল চন্দ্রভান (১৮৭৭)।

আবদুল ছাত্তার (ওরফে দেবাস্তুল্লা; মেদিনীপুর-হোসেনাবাদ নিবাসী): হুরমুর বিবির কেচ্ছা; শশীমুখী জনমসখী; ইত্যাদি।

আবদুল জব্বার (মেটেবুরুজ-কাটালবাড়িয়া নিবাসী): গোলসানে রুম বা কেচ্ছা দেলখোস (রচনা ১৮৯৬)।

আবদুল মজিদ, শেখ: পানিকৌড়ের পুথি (ঢাকা ১৮৯৬)।

আবদুল সামাদ: নসিহৎনামা (১৮৭০)।

আবদুল হাকিম: লালমতি সয়ফুলমুলুক (১৮৭০); ইউসুফ জোলেখা (১৮৭৪)।

আমীরুদ্দিন, শেখ: মনছুর হাল্লাজ ও সমছ্ তবরিজের কেচ্ছা।

আয়জদ্দিন, শেখ (হুগলী-বালিগড়-তালপুর নিবাসী):[২] গোল আন্দাম

---

[১] ইনি সাবরেজিষ্ট্রার ছিলেন। জন্ম ৪ বৈশাখ ১২৬৬। ইঁহার অপর গ্রন্থের বিষয় "কেয়ামত মৃত্যু আর পীরের কথন"।

[২] ইনি প্রকাশক ছিলেন, সুতরাং সব বই এঁর রচনা না হওয়াই সম্ভব।

(রচনা ১২৯০); ছেকান্দরনামা (রচনা ১২৯২, বাহ্রির কাব্যের অনুবাদ); সতীবিবির কেচ্ছা ; পরিবানু শাহাজাদী ; মোরসেদনামা (রচনা ১৩১৫); ইত্যাদি।

আয়েনালি সিকদার : বিধবাবিলাস (ঢাকা ১৮৬৮)।

আল্লা হামীদ (চাটিগাঁ নিবাসী) : আমীর সৌদাগর ও ভেলুয়াসুন্দরী (১৮৭৭ ; বড় বই)।

ওছিমুদ্দিন শাহা : কেচ্ছা অভয়দুর্লভ।

কমরদ্দীন (হাওড়া-জালালদি নিবাসী) : বেনজীর বদরে মুনির।

কমরুদ্দীন : আহাম্মকনামার পুথি (১৮৭৫)।

কাইমদ্দিন, পণ্ডিত (চাটিগাঁ নিবাসী) : চমন বাহার।

কিনু, শেখ : আশিকী কামাল (ঢাকা ১৯৬৯)।

গোলাম কাদের : শীত ও বসন্ত (১৮৭৩)।

গরীবুল্লা (ঢাকা নিবাসী) : দিলারামের পুথি (হিন্দীর অনুবাদ); নেক-বিবির কেচ্ছা।

জয়নাল আবেদিন : আবুনামার পুথি।

জামালুদ্দীন, শেখ : বেভাসনামা (১৮৮০)।

জিন্নত আলী, সৈয়দ (ত্রিপুরা নিবাসী) : বাগবাহার মাহিগীর ; কটুরমিঞা ও কর্পূরনেছা ; আলাউদ্দিন ও শাহাজাদী বদরুল বদর।

জোবেদ আলী খোন্দকার, শাহ (ময়মনসিংহ নিবাসী) : নইদাচান্দ কুস্তিরের পুথি (রচনা ১৩১৩); জুয়ান গদাই ও বেলমতি কন্যার পুথি।

তাজুদ্দিন খান ও কাজি রৈহানুদ্দীন : শিরি ফরহাদ (১৮৭৮)।

নিজামুদ্দীন : বাহারে বারবাহার জাহান (১৮৭৬)।

ফকীর মহম্মদ : ইউসুফ জোলেখা (১৮৭৬)।

ফসিহউদ্দীন আহম্মদ : কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী।

বাতাসু সরকার : ছিলছত্র রাজার জঙ্গ।

বেলায়েত হোসেন[১] : ফেসানায়ে আজায়েব।

মহম্মদ ছাদ : মহব্বতনামা।

মহম্মদ দেরাস্তল্লা : রাতকানা জামাই।

[১] বেলায়েত হোসেন অনেক ভালো গান রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

মাল্লে মহম্মদ : সয়ফুল মুলুক (ঢাকা ১৮৭৫)।

মোহম্মদ রফিউদ্দিন (কুমিল্লা নিবাসী) : জেবল মুলুক সামারোকের পুথি।

রমজানউল্লা, শেখ (চানক-পলতাপাড়া নিবাসী) : কলির নছিহত।

শাহ খোন্দকার : কেচ্ছা শাহে রুম (১৮৭৬)।

শাহা নুর : সাত কন্যার বাখান।

সৈর বাজ : কাসেমের লড়াই।

সৈয়দ আলী পালোয়ান : সবুরন্নেসা (১৮৭৮ ; হিন্দীর অনুবাদ)।

হায়দার আলী : স্বরূপরূপসী (১৮৬৯)।

এর মধ্যে কোন কোন বইয়ের একটু বিস্তৃত পরিচয় দিচ্ছি।

হুরনুর বিবির কেচ্ছার উপসংহারে আবদুল ছাত্তার-"দেরাস্তল্লা" এইটুকু আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন

> শুন শুন বন্ধুগণ আরজ আমার
> আছে মোর একজন প্রিয় দোস্তদার।
> একদিন মোর তরে কহিলেন তিনি
> তুমি মোরে লিখে দেহ একটি কাহিনী।
> আমি উপরোধ তার লাড়িতে নারিয়া
> কলম লইনু হাতে বিসমিল্লা বলিয়া।
> লিখিতে করিনু শুরু কেতাব রঙ্গীন
> রচিনু কেতাব এই হইল কতদিন।
> আমি হীন দেরাসতুল্লা বড়ই অধীন
> মেদনীপুর হোসেনাবাদে কদিমি সাকিন।
> কেশপুর অধীনেতে গ্রাম টাপুরিয়া
> সেখানে মক্তব করি শুন মন দিয়া।
> আমার দোস্তের নাম শোন দীনদার
> যাহার আদেশে করি কেতাব তৈয়ার।
> শেখ দবীরুদ্দীন পিতা আমীরুদ্দীন নাম
> দাদা হাজী বসিরুদ্দীন শোন হে এছলাম।
> বসবাস তাহার সাকিম নথজুরবনি
> রনপাড়া লাউড়ীআর সামিলেতে জানি।

কেশপুরের পশ্চিম আধ ক্রোশের অন্তর
মেদনীপুর জেলা হয় শোন বেরাদর।
এই এক পরিচয় হইল তামাম
দোষ ঘাট মাফ কর যতেক এছলাম।

বইটিতে অনেকগুলি গান আছে। কতকগুলি গানের ভাষা হিন্দী মেশানো। একটি উদাহরণ দিই "বাংলা হিন্দী মেশান গজল"-এর।

সানাম নেহি আয়া মেরি সোভে আছে বাগে গুল
কেমনেতে হবে সোভা ফুলে না বসিলে বুলবুল।
দেল বাহা বেকারারি এয়ার নেহি আয়া কেও
ভেবে মরি দিন দুবেলা কেন্দে কেন্দে প্রাণ আকুল।
রোতি হেয় দেল হামারি দেরাস বলে আহা মরি
আও সানাম গলেকি হার তুমি আমার জাতিকুল॥

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইসলামি গ্রন্থের বোধ করি প্রধানতম লেখক ও প্রকাশক ছিলেন শেখ আয়েজদ্দীন। ইনি অনেক বই কাহিনীকাব্য ও ধর্ম কাব্য লিখেছিলেন এবং লিখিয়েছিলেন। ১২৯০ সালে রচিত গোল-আন্দামে এঁর এই পরিচয় আছে

সহর হুগলি জেলা হরিপাল থানা
তার নিকটে আছে বালিগড় পরগনা।
তাহার মধ্যেতে গ্রাম নামে তালপুর
সেথানে আজিজথানা জানিবে হুজুর।
নামেতে গোরাই শেখ দাদাজির নাম
বজরগের বজরগ তিনি বড়া নেকনাম।
সেখ কিনু বাবাজির এছম সরিফ
চাচাজির নাম মেরা ছিল সেখ তারিফ।
দুই ভাই ছিল তারা বড় নেকজাত
দশ সাল হৈল দোন পাইল ওফাৎ।...
মুনশি তাজদ্দিন মহাম্মদ মরহুমের
সব দেশে নাম তার আছেত জাহের।

তেনার ভাতিজা মুনশি মনিরুদ্দিন নাম
খাহেসে তাহার লিখি কেচ্ছা গোলান্দাম।

ময়মনসিংহের আবদুল রহিম অনেক বই লিখেছিলেন (বা সংস্কার করেছিলেন)। এঁর পিতা হাজী বরকতুল্লার মৃত্যু হয়েছিল ১২৬৮ সালে। দেল-দেওানার শেষে কবির দৈন্যোক্তি উল্লেখযোগ্য।

এলাহি করহ মাফ তকছির আমার
বান্দা তেরা গান্ধা আমি বড়া গুনাগার।
ছের না তুলিতে পারি গুনার ভারেতে
লইয়া গুনার বোঝ ডাকি জোড়হাতে।
শুনিয়াছি নাম তেরা করিম গফ্যার
একবার লেহ আল্লা খবর আমার।
বঙ্গদেশে পৈড়ে আছি গুনাতে ডুবিয়া
লইবে খবর মেরা সদয় হইয়া।

কলিকাতা নিবাসী শেখ আমীরুদ্দিন তাঁর মনছুর-হাল্লাজের প্রারম্ভে এই আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন

মাসাএখ মনছুরের কেচ্ছা ফারছিতে
লিখিয়াছিলেন কোন ফাজেল লোকেতে।
সেই তো রেছালা ফের উরদু জবানেতে
হইল তরজমা কলিকাতা সহরেতে।
আবদুল খালেক নাম মৌলবি ছাহেব
লিখিয়াছিলেন নজমেতে বেআয়েব।
সেই ত রেছালা ফের এছলামি বাঙ্গালায়
লিখিতে এরাদা হৈল খাহেস আমায়।...
হিন আমিরদ্দিন আমার নাম ভাই
কলিকাতা সহরেতে বসতী সদাই।
কড়েয়া সাকীন জেলা চব্বিশপরগনা
ফকীরখানার এই জানীবে ঠিকানা।
ওয়ালেদের নাম মেরা শুন দীনদার
মরহুম মহম্মদ দুখি সরকার।

রেছালা দেখিয়া জবে তৈয়ার হইল,
দেখিয়া শুনিয়া সবে মালুম করিল।
এক রোজ ফকিরের ডেরায় আসিয়া
দেখিলেন সেখ জমিরুদ্দিন পড়িয়া।
সেখ জিয়াওদ্দিন বাপের নাম তার
বাড়ি তার বন্দিপুরে হুগলি জেলার।...
এই পুথি চাহিলেন খাহেস করিয়া
বলিলেন দেহ আমি দিব ছাপাইয়া।
খোসাল হইয়া আমি দিনু যে তাহারে
সুরু করিলেন লিয়া ছাপিবার তরে।
বাঙ্গলা লোকের কেচ্ছা শুনিতে খাহেস
তে কারণে বাঙ্গালাতে করিনু ফাহেস।

আলী, হানিফা প্রভৃতি খলিফা ও মুসলীম ধর্মবীরদের নিয়ে কয়েকটি ছোট ছোট আখ্যায়িকা-কাব্য লেখা হয়েছিল। এগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে নাম করা যায়,—গরীবুল্লার ও ফকীর মহম্মদের 'সোনাভানের পুথি'; ফকীররুদ্দীনের 'ইমামচুরির পুথি'; নয়ান, মহম্মদ এবাদত খান, ও বক্তিয়ার খানের 'সুর্জ-উজ্জাল বিবির পুথি' (১৮৬৭); রমজানউল্লা ও খলিলুদ্দীন গাইনের 'ভানুবতীর লড়াই'; আসিরুদ্দীনের 'জোলমাতনামা', জয়নাল আবেদিনের 'আবুসামার পুথি' (১৮৬৭); ইত্যাদি।

১৮

পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য গাথা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ববঙ্গের মুসলমান গ্রাম্য কবিরা স্থানীয় কিংবদন্তীর উপর রঙ ফলিয়ে ছোটখাট "কেচ্ছা" গাথা চালিয়েছিলেন। এই রকম একটি রচনার পরিচয় দিচ্ছি, মোহাম্মদ ইউনুছের 'আবদুল আলী গাজী ও নিবারণসুন্দরীর পুথি'। কবি নিজের সম্বন্ধে বলছেন

আমি অতি মূর্খমতি বিদ্যাবুদ্ধিহীন
ছোট কালে পাঠশালাতে পড়েছি কত দিন।
বিদ্যাবুদ্ধিহীন কিন্তু মূর্খ পণ্ডিত
সায়েরি করিতে ইচ্ছা মনের বাঞ্ছিত।

কাহিনীর নায়ক সালপাকাটি নিবাসী আবদুল আলী, বয়স কুড়ি বছর। একদিন সে ঘোড়ায় চড়ে বরিশাল শহরে গেল তামাসা দেখতে। ঘুরতে ঘুরতে একদল পাহাড়ে বেদেকে দেখতে পেলে। সঙ্গে তাদের অনেক সাপের পেটরা। তাদের একটি মেয়ে আবদুল আলীর নজরে পড়ল।

ঘাড়ওয়ালের এক মেয়ে ছিল বয়স পনর ষোল
আর্শি চেয়ে চুল ঝাড়ে চিরুণী লাগাই
যেয়ছা মেয়ের মুখের ছটা নারাঙ্গি হৃদের গোটা
হুরপরী মোহ যায় থাকুক গোসাই।
কপালে তিলক ফোটা জানুশোম কেশের জোটা
আকুমার আছে কন্যা বিবাহ হয় নাই
মায়ের দুর্লভ ধন নাম রাখে নিবারণ
আচম্বিতে আবদুল আলীর নজরে পড়ে যাই।
নিবারণকে চক্ষে দেখি পলক না মারে আঁখি
প্রেমবাণ হৃদে আসি বিন্দিলেক সাই

আবহুল আলী যেই স্থানে নজর করে নিবারণে
দুইজনের দৃষ্টির প্রেম চক্ষের আসনাই।
দু-জন দুইখানে রহে ছটফট অঙ্গ দহে
ভঙ্গপ্রেমে কদাচিৎ রঙ্গ লাগে নাই
কহে কবি হীনমতি চৌপদীতে দিয়ে ইতি
আবহুল আলীর বিবাহ কথা পয়ারে জানাই॥

বেদেদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে আবহুল আলী অনেকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু কেউই তাকে গ্রাহ্য করলে না। আবহুল আলীও ছিল "গারুড়ী" অর্থাৎ সাপের গুণিন। সে মন্ত্র পড়ে সব সাপকে নিস্তেজ করে দিলে। পরের দিন খেলাতে গিয়ে বেদেরা দেখে কোন সাপই মাথা তুলছে না। তারা বুঝলে এ সেই বিদেশী লোকটিরই কাণ্ড। তারা আবহুল আলীকে ডেকে নিয়ে এসে খাতির করলে। আবহুল বললে, যদি নিবারণের সঙ্গে আমার বিয়ে দাও তবেই "কুণ্ডলী হইতে সর্প করিব খালাস"। তারা তাতে রাজি হল। বাসরঘরে আবহুল

শুইল পালঙ্গে যাই কন্যা কোলে করি
কানাই পাইল যেন রাধিকাসুন্দরী।
ছয়ফুল-মুল্লুক যেন পাইল লালমতী
রত্নসেন পায় যেন কন্যা পদ্মাবতী।

মাস দুই সেখানে কাটিয়ে আবহুল নিবারণকে ঘরে নিয়ে এল। তার বুড়ি মা পুত্রবধূকে পেয়ে খুশি হল।

একদা রাত্রিতে নিবারণ স্বপ্ন দেখলে এক অজগর সর্প তাকে বলছে,

নিবারণ তোমাকে বলি তোমার পতি আবহুল আলী
জানে সর্প ধরিতে
পটুয়াখালি দক্ষিণমুখি থাকি ঘাড়াতে
দৌল্লা একটা পাঠা নিবে আমায় ধরিতে।

ভয়ে তার ঘুম ভেঙে গেল। আবহুলকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত সে বললে।

এত শুনি আবহুল আলী প্রভুর নাম নাহি বলি
দর্প করে কয়
পাঠা বলি চাহে সেই কোন সর্প হয়
পাঠা না দি ধরিব সর্প তাতে কিবা হয়।

পটুয়াখালি যাবার জন্যে নৌকা সাজানো হল। মা তার নিষেধ করতে লাগল

বারে বারে যাওরে নিমাই নাহি করি মানা
আজি কেন মায়ের মনে প্রবোধ মানে না।
নাহি যাও বাছাধন মায়ের কথা শুনি
আজিকার মহিম ক্ষেন্ত কর যাদুমনি।

কবি বলেছেন যে ঘটনা ঘটেছিল সেদিনে,

তের শ পনের সনে মাঘ মাসের আট দিনে
বরিশাল জিলায়
বরিশালের অন্তর্গতে ঘটনা উদয়
কহিতে সে সব কথা প্রাণে নাহি সয়।
সে সব কথা বলিতে বাসনা হইল মনেতে
শুনেন সর্বজন
কর্ণ লাগাইয়া শুনেন সে সব কথন
কিরূপে সে আবহুল আলীর হইতেছে মরণ।

কারো নিষেধ না শুনে আবহুল সাপ ধরতে গেল ধলা পাঁঠা না নিয়ে। লোকজনকে নৌকায় রেখে সে একলা গাড়ার কাছে গিয়ে মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিয়ে বাঁশি বাজাতে আর সাপকে লোভ দেখাতে লাগল

দৌল্লা পাঠা আনিয়াছি তোমার লাগিয়া
ঘাড়া হইতে উইঠে একবার যাও দেখা দিয়া।
শীঘ্র আসি ঘাড়া হৈতে না করিও ভয়
না উঠিলে ঘাড়া খুদি করিব নিশ্চয়।

শঙ্খরাজ সাপ ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ত থেকে বেড়িয়ে এল।

কোম্পানীর ইঞ্জিনের কলে কল টিপিলে ধুয়া চলে
সো-সো শব্দ ভয়ঙ্কর
সেই মত উঠে সর্প করি চূর্ণকার (?)
শুনিয়া সে শব্দ আবহুল কাঁপে থর থর।

সওয়া হাত সাপ পঁয়তাল্লিশ হাত হল। আবহুলকে নিয়ে সতের জোড়া বাঁশ গাছের সঙ্গে পেঁচিয়ে ডগায় উঠে গেল। "ভলকে ভলকে রক্ত পড়ে সে বাঁশের গোড়ায়"।

কাটাখালীর তমিজদ্দিনের ভাই মফিজদ্দিন সেখানে গিয়েছিল বাঁশ কাটতে। উপর থেকে তার গায়ে এক ফোঁটা রক্ত পড়তে চেয়ে দেখে সে দৌড়ে গিয়ে খবর দিলে। গুণিনের ঘরেও খবর গেল। ধলা পাঁঠা নিয়ে নিবারণ সেখানে এল। তারপর আয়োজন করে মন্ত্র পড়ে মাটিতে ঘেঁচি কড়ি ফেলে দিলে, কড়ি ঘুরতে লাগল। তখন

কড়িকে বলিল ধনি আগে ছিলে কার
আগে ছিলাম তব পিতার এখন তোমার।
মোর যদি হবে কড়ি কহি বারে বার
মস্তকে কামড়ি ধর সর্প শঙ্কুরার।
এত শুনি সেই কড়ি কুদিয়া চলিল
সর্পের মস্তকে সেই কামড় মারিল।

কড়ির কামড়ে জর্জর হয়ে সাপ পড়ল মাটিতে, "পাঁচল্লিশ হাত সর্প ছিল সোয়া হাত হয়"। নিবারণ সাপকে হাঁড়িতে ভরে ফেললে। আবদুলকে বাঁশঝাড়ের ডগা থেকে নামান হল। ঝাড়ফুঁক চলল। অনেকক্ষণ পরে শ্বাসের চিহ্ন দেখা গেলে তাকে নিয়ে চলল বাড়িতে। পথে আটকালে আমতলি থানার দারোগা হীরালাল বাবু। বলা হল লাস সাপে-কাটা রোগীর। হীরালাল দারোগা বিশ্বাস করলে না, বললে

সাপকাটা লাশ হৈলে হাত পাও কেন ভাঙ্গিলে
সত্য করে কও
অনাহুক কথা কেন কহিয়া বাড়াও
পষ্ট ভাবে কথা বৈলে সম্মান নিয়ে যাও।
দেখ চিনা বেত দিয়া ফাটাইয়া দিব টিয়া
বুঝিবে পাছে
স্বামী মেইরে বলছে মাগি সর্পে কাটাইছে
এ সব কথা নাহি খাটে পুলিশের কাছে।

পুলিসের দাওয়াই বেদের মেয়ে নিবারণের ভালো জানা ছিল। তাই

এত শুনি নিবারণ ভয় পেয়ে মনে মনে
বুদ্ধি কৈল সার
দশ টাকা গোপনে দিল হাতে দারোগার
ঘুস পেয়ে হীরালালে কহিল সভার।

নিবারণের জবানবন্দি শুনি সব কথার সন্ধি
চলে ঘটনার স্থান
তদন্ত করিয়া পরে আসে তুরমান
উপরে লিখিয়া দিল সর্পে-কাটা মরণ।

ঘরে এসে নিবারণ সাপকে উপলক্ষ্য করে নিজের বড়াই করতে লাগল। তা শুনে "আরশে থাকিয়া আল্লা হইল বেজার"। তিনি কড়ির গুণ নিলেন হরণ করে এবং নিবারণকে মন্ত্র ভুলিয়ে দিলেন। সাপ আবার তার পূর্বের তেজ ফিরে পেলে, আবদুল আলীর দেহ মুখে তুলে নিয়ে আকাশে উঠল। নিবারণও তার শাশুড়ী মাটিতে লুটিয়ে কাঁদতে লাগল।

সাপ যখন মূলাদিনগরের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে তখন এক গৃহস্থের বউ উঠান ঝাঁট দিচ্ছিল। মেঘগর্জন শুনে সে আকাশ পানে চেয়ে দেখলে মুখে মানুষ নিয়ে অজগর শূন্যে উড়ে চলেছে। সে শাশুড়ীকে ডেকে এনে দেখালে আর বললে, "আপনার হুকুম হইলে নামাইতে পারি"। বউটি ছিল গুণিন।

অবলা কালেতে বধূ মা-বাপের ঘর
মিয়াজির নিকটে শিখিয়াছিল মন্তর।

শাশুড়ী খুশি হয়ে অনুমতি দিলে। তখন সে

হুকুম পেয়ে মন্ত্র পঠে হস্তের পিছা দিয়া
মৃত্তিকাতে তিন বারি মারিল কসিয়া।
উর্ধ্বমুখি মৃত্তিকাতে ধূম জালাইল
সেই সহরেতে সর্প নামিয়া আসিল।

সাপকে কাবু করে তাকে দিয়ে বউ আবদুলের বিষ উঠিয়ে নিলে। সাপ চলে গেল, চার দণ্ড পরে আবদুল উঠে বসল। সকলে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, সে কেঁদে সব কথা বললে। তার পরে সুস্থ হয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেল।

১৯

শাস্ত্র-কথা

ইসলামি শাস্ত্রের অনুবাদ, ইসলামি যোগধ্যান, তন্ত্র, নিত্যকৃত্য ইত্যাদি নিবন্ধ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে প্রচার লাভ করতে থাকে পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করে চাঁটিগাঁ অঞ্চলে। কয়েকটি নাম করছি। মুজম্মিলের 'ছাহাৎনামা' ইসলামি জ্যোতিষ ও নিত্যকৃত্যের বই। এটির রচনাকাল ১৬৭৯ শকাব্দ (১৭৫৭ খ্রী)। লেখকের গুরু ছিলেন শাহা বদরুদ্দীন।

> শাহা বদরদ্দীন পীর কৃপাকুল ভারি
> শতমুখে সেই বাখান কহিতে না পারি।
> তাহান আদেশমাল্য মস্তকে ধরিয়া
> রচিলেক মুজম্মিলে মনে আকলিয়া।

মোতলিবের 'কিফায়তোল মোছল্লিন' বড় বই, আরবীর অনুবাদ।[1] এটিকে 'ইসলামি হিতকথা' বলা যেতে পারে। মৌলবী রহমতুল্লার অনুরোধে বইটি লেখা হয়েছিল।

> মৌলবি রহমতোল্লা সর্বগুণধাম
> চতুর্দশ এলম অবধান অনুপম।
> তাহান আদেশে শেখ পরাণ-নন্দন
> হীন মোতলিবে কহে শাস্ত্রের বচন।

গ্রন্থশেষে বাংলায় ইসলামি শাস্ত্রকথা ব্যক্ত করার জন্যে লেখক ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন

> আরবি ত সকলে না বুঝে ভাল মন্দ
> তে কারণে বাঙ্গালা রচিলু পদবন্ধ।
> মোছলমানি শাস্ত্র [আমি] বাঙ্গালা করিলু
> বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু।
> কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে
> বুঝিআ মুমীন দোআ করিব আমারে।

[1] ১২৮১ মঘী সালে লেখা পুথির পরিচয় দ্রষ্টব্য ('বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' প্রথম খণ্ড প্রথম ভাগ পৃ ১৩২-৩৩।)

চাটিগাঁ-নিবাসী মহম্মদ আলী 'কিফায়েতোল মোছল্লিন' অনুবাদ করেছিলেন, ইছুপ হাফিজের অনুরোধে।

বদিউদ্দীনের 'চিপ্ত ইমান'-ও বড় বই। শেষে এই পরিচয় আছে

> আর গুরু চাম্পাগাজী নয়ানের জুতি
> খিতাপচর শুভগ্রাম তাহাতে বসতি।
> বাঙ্গালা ভাষা জ্ঞাত মোর সেই গুরু হোতে
> মুখে পাঠ হৈতে লেখিছিলা নিজ হস্তে।
> দীন ইছলামের কথা শুন দিআ মন
> দেশী ভাষে রচিলে বুঝিব সর্বজন।
> এ সকল চিপ্তমান্ কিতাবেত পাই
> কহেন্ত বদিয়দ্দিনে পআর মিলাই।

চাটিগাঁ অঞ্চলের অপর উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ সৈয়দ নুরুদ্দীনের 'দাফায়েতল হাকায়েৎ' (ফারসীর অনুবাদ, বড় বই), মহম্মদ কাছিমের 'সুলতান জমজমার পুথি', মহম্মদ ছকির 'নূরকন্দিল', আবদুল করিমের 'নূরফরামিসনামা', শাহা রজ্জাকের তনয় আবদুল হাকিমের 'নূরনামা', ইত্যাদি। সুলতান-জমজমার পুথিতে বৈষ্ণব ভাব লক্ষ্য করা যায়। যোগের ছড়াও লেখকের জানা ছিল। যেমন,

> জলে চরে হংসাহংসী করে হাসি-রসি
> হংসা যাএ নিজ ঘর জল কেনে দুষী।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কলিকাতার প্রকাশকেরা ইসলামি ধর্মনিবন্ধ —অধিকাংশই আরবী-ফারসীর অনুবাদ—প্রচুরভাবে বার করতে থাকে। এই ধারা ক্ষীণ হয়ে এল বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে। তখন উত্তরপশ্চিম থেকে আরবী শিক্ষার ঢেউ এসে পড়েছে।

মালে মহম্মদের 'আহকামল জোমা'-র রচনা সমাপ্ত হয়েছিল ৫ই আশ্বিন ১২৬৩ সালে। এঁর পিতা শেখ নূরি মারা যান ১২৩২ সালে। মালে মহম্মদ আত্ম-পরিচয়ে লিখছেন, পিতৃহারা হয়ে

> মালমাত্তা হসমত   নাহি কিছু দওলত
> গরিবী হালেতে গোজরান।
> আমাদের জন্মস্থান   পরগনা সোনারগ্রাম
> ডিঙ্গুরকান্দি ছিল গাঞের নাম

মোছলমানী সরাহতে তৌবা কৈনু বুরা বাতে
মোখালেফ হইল তামাম।
বাপ-দাদার এজ্জত পরে কেহু না জুলুম করে
ভাবি আমি একা রহিলাম
এই ভাবি দেলে খাটি মৈলে কেবা দিবে মাটি
যাব আমি যেথানে এছলাম।
এইভাবে দেশ ছেড়ে আসি আমি বাগাপুরে
ছিল জাগা বড় বিয়াবান
জঙ্গল কাটি বাড়ি কৈল পিছে বড় আবাদ হৈল
বন ঘুচি হইল রওসন।
তাতে দুই জমিদারে লড়াই ফছাদ করে
ঐ জাগা করিল উজাড়
সেই ভয় জাগা ছেড়ে আসিয়া আবদুল্লাপুরে
বাড়ি করে আছি গোনাগার।

বিরাট 'কাছাছোল আম্বিয়া' রচিত হয়েছিল প্রকাশক কাজী সফিউদ্দীনের প্ররোচনায়। এর প্রথম খণ্ড বেরিয়েছিল ১২৬৮ সালে। পর পর তিন জন কবির চেষ্টার ফল এই বই। রেজাউল্লা রচনা করেছিলেন নুহ নবীর কাহিনী অবধি। রেজাউল্লার আত্মপরিচয়

সাএরের কথা কিছু শোনহ আগাম
গোনাগার খাকছার রেজাউল্লা নাম।
মুনশী লেহাতুল্লা নাম আমার পিতার
অধীন কাঙ্গাল আমি একি লাড়কা তার।
কুচ করিলেন তিনি ছাড়িয়া দুনিয়ায়
লাড়কাই ওম্বর মেরা ছিল সে সময়।
আমার আহওাল যত করিতে জাহের
নারিনু এথানে এবে হয় বড় দের।
হুগলি জেলার বিচে চৌমাহা পরগনা
মিঞাবেড় নামে গাঙ আমার ঠেকানা।

গোরিবা বাসেন্দা নাম সেখ চান্দ দাদা
তাহাদের গোনা খাতা মাফ কর খোদা।
একে গোনাগার আমি দিন দুনিয়াতে
বন্দি হৈয়া আছি তাতে সওকের হাতে।
হামেসা আমার দেলে করে এ পয়গাম
করহ সায়ের কিছু কেতাব কালাম।
মোদাম দুনিয়ার কামে মসগুল হৈয়া
নাহক সময় সব দেও গোঙাইয়া।
কহ কিছু কেচ্ছা আর কালাম এরছাই
শুনিতে সওক করে সওকিন সবাই।
তাহাতে ফায়দা হয় লোগের খাতের
দিলে দোওা ভাল তেরা হইবে আখের।
মনের খাহেসে তাহা আছিনু তল্লাসে
করি কোন কেচ্ছা আমি বাঙ্গলার ভাষে।
কহিলেন পরে মুঝে বহুত লোকেতে
কাছাছল আম্বিয়া কর রচনা বাঙ্গলাতে।
লোকেতে খাহেস বড় করেন এহার
হইবে ফায়দা এতে মোমিন সবার।
আর এক দোস্ত মেরা বন্দিপুরে ঘর
হুগলি জেলার বিচে জান বেরাদর।
কাজি সফিউদ্দি নাম বড়া হোসমন্দ
কাজি দেলেরদ্দির তিনি জানহ ফরজন্দ।
জরুরি করিয়া তিনি কহিল আমায়।
আম্বিয়া লোকের কেচ্ছা কর বাঙ্গালায়।
এছলামি বাঙ্গালায় কেচ্ছা রচনা হইলে
ইহার নাফাতে লোগ পঁউছিবে সকলে।
ফারছি থাকিয়া সেহ হৈয়াছে হিন্দিতে
আওয়াম লোকেতে কেহ না পারে পড়িতে।
হইলে বাঙ্গালা ভাষে বাঙ্গালার লোক
পড়িলে বুঝিতে পারে কেচ্ছার সওক।

হিন্দি ও ফারসি নাহি জানে বহু জন,
নাওম্মেদ হৈয়া তারা রহে দুখি-মন।
যে যার দেশের বুলি বোঝে সবে ভালো
যেঁয়ছাই জবান আল্লা যার তরে দিল।
শুনিয়া তাদের কথা হইল মুঝে ভারি
আমি অতি মুক্ষ করি কিরূপে সায়েরি।
ভাবি মনে আল্লা বিনে নাহি মদদগার
যেবা যাহা ঢোঁড়ে তারে দেয় পরওার।
সেই ভরসাতে আমি ওম্মেদ রাখিয়া
সমুদ্দুরে দিনু ঝাঁপ কোমার বান্ধিয়া।

রেজাউল্লা পরলোক গমন করার পর এই নবীকাহিনী অনুবাদের ভার পড়ল 'মনছুর হাল্লাজ'-এর লেখক আমীরুদ্দীনের উপর। ইনি রচনা করলেন হজরৎ মুহম্মদের খোদেজার সঙ্গে বিবাহে-র পূর্ব পর্যন্ত। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে আমীরুদ্দীন প্রকাশকের সাংসারিক কথাও কিছু বলেছেন।

সায়েরের নাম কিছু শুন বেরাদর
হীন আমিরুদ্দিন এ দেশে করি ঘর।
কলিকাতা সহরেতে মোকাম কড়ায়াতে
বাপ দাদা থাকিতেন এই সহরেতে।
ওয়ালেদ মরহুম যে ছিলেন নেককার
নাম তার মহাম্মদ দুখি সরকার।
দাদাজির এছম ফকির মহম্মদ
না পারিনু লিখিতে খুবির তার হদ।
বড় দীনদার মর্দ্দ ছিলেন দুনিয়ায়
আজি তক অনেক তারিফ করে তায়।
আমার পিরের নাম শুনহ মোমিন
গওছ হাফেজ খাজে আফতাবদ্দিন।...
তার পর যার কাছে হইনু তালকিন
নাম তার হজরত খাজে মিছকিন।...

দীনের কালাম কিছু লিখিবার তরে
ফায়াদা যাহাতে মেলে যত দীনদারে।
দেলেতে খেয়াল এয়ছা করি যে বসিয়া
বলিলেন একদিন আমাকে আসিয়া।
কাজী সফিউদ্দিন নাম নেক মছলমান
নেহাএত দোস্তদার বড় মেহেরবান।
হুগলি জেলার বিচে বন্দিপুরে ঘর
বড় হোসমন্দ মর্দ্দ খুব নামুওর
কাজি দেলেরদ্দি নাম ওয়ালেদ তাহার
কাজি আমিরউল্লা নাম দাদার তাহার।
কাজি সফিওদ্দি ওই সহর বিচেতে
অনেক কেতাব ছাপাইলেন ভাতে ভাতে।
পরে এই কেচ্ছা কাছাছোল আম্বিয়ার
ছাপাইতে কোমর বান্ধিল নেককার।
মুনশি রেজাউল্লা নামে বড় কবিকার
পহেলা জেলেদ কেচ্ছা সায়েরি তাহার।
আউল জেলেদ তিনি সায়েরি করিয়া
জেন্নাত নছিব হৈল ওফাত পাইয়া।
বাকি যাহা ছিল তাহা সায়েরি করিতে
বলিলেন কাজিজি আমার খাতিরেতে।
তাহার কথায় হৈল খাহেস আমার
লিখিতে করিনু শুরু এই ত কেচ্ছার।
দুছরা জেলেদ ফের ছাপিবার তরে
শুন ভাই দের হৈয়া গেল যে খাতেরে।
কাজির মিরাছ বাড়ি ছিল বন্দিপুরে
কেহ তাহা ফেরেবেতে চাহে লইবারে।
ফেরেবি মামলা পেস নাহক করিল
তাহার ছববে মর্দ্দ পেরেসান ছিল।
তার বিচে সায়েরের ওফাত হইল
এই দুই ছববেতে দেরি হৈয়া গেল।

কেতাব ছাপিতে নাহি গাফেলি তাহার
নাগেহানি হরকতে ছিলেন লাচার।
এখন করহ দোওা যত দীনদার
দুস্মন জাহানে যেয়ছা না থাকে তাহার।
করিলেন শুরু ফের কেতাব ছাপিতে
আল্লা যদি করে দের না হবে এহাতে।

শেষ অংশ লিখলেন আশরফ আলী, হজরৎ মুহম্মদের বিবাহ থেকে হজরৎ আলীর কাহিনী অবধি। রচনা সমাপ্তির তারিখ ১৮ মাঘ ১২৬৭ সাল। শেষে লেখকের আত্মপরিচয়

ঠেকানা আমার সব লিখিতে হইল
যদি কেহ কহে সায়ের কোথাকার ছিল।
নাম গ্রাম আপনার সবাকে জানাই
অধীন আসরাফ কহে শোন সবে ভাই।
ফরিদ বাপের নাম বাড়ি ফরিদপুর
জানিবারে কহিলাম এছলাম হুজুর।
জঙ্গিতে পাঠান পদ্দি খেতাব আমার
কহিনু সকল বাত জোনাবে সবার।..
আমার পয়দাস এই কলিকাতা সহরে
মলঙ্গা নামেতে জাগা মাশুর সবারে।
বক্তগুণে জন্মভূমি আইনু ছাড়িয়া
হাল সাকিন করিনুন কড়ায়া আসিয়া
গোজরিল কড়ায়াতে তিরিশ বছর
সবাকে লিখিয়া সব জানানু খবর।
কড়ায়্যাতে কসাইর মছজেদ আছে যেথা
মছজেদ সামেন বাটী জানিবেন সেথা।
বাড়িঘর কোথা ফকিরখানেতে গোজরান
এই তক হাল জানাইনু মেহেরবান।

তামাম করিনু ইতি হইল যে সায়
বারো সও সাতসট্যি সাল চলে বাঙ্গালায়।
আঠার তারিখ মাঘ রোজ বুধবারে
জোহরের নামাজবাদে বোঝ বেরাদরে।
আখেরি জেলেদ কেচ্ছা কাছাছল আম্বিয়া
নবিজির তোফেলে গেল তামাম হইয়া॥

ধসা-নিবাসী জোনাব আলী লিখেছিলেন 'হকিকাতচ্ছালাত', 'ফজিলতে দরুদ', 'জিয়ারতে কবর', ইত্যাদি। শেষ বইটিতে এই গ্রন্থপরিচিতি ও আত্মপরিচয় আছে

জনাব হাফেজ ছফি আবদুল করিম
বালিয়া উদঙ্গে যায় বসত কদিম।
দরুদ কিবরিয়া নামে রেছালা উর্দুতে
তালিফ তছনিফ করিলেন খুবি সাতে।
সে কেতাব হৈতে আমি বাঙ্গলা জবানে
রচনা করিনু ঠিক তরজমার মানে।
তাতে খাতা পাও আতা কর দীনদার
সরম না দেহ মুঝে লোগের মাঝার।
অধীন জনাব আলি এ হীনের নাম
হাওড়া জেলার বিচে ধসায় মোকাম।
আমীর মরহুম নাম মেরা কেবলেগার
নেক পাক ছিল তিনি মকবুল আল্লার।
দাদা ছাহেবের নাম গোলাম রছুল
তিনি বি ছিলেন অলি খোদার মকবুল।
মা-বাপ ওস্তাদ-পীর সবাকে ছালাম
আমিন আমিন হৈল কেতাব তামাম॥

হানাফী সম্প্রদায়ের তত্ত্বকথা নিয়ে শাহ আবদুল সগীর লিখেছিলেন পদ্যে 'অথর্ব মহম্মদী বেদ'। পুস্তিকাটি কলিকাতায় ছাপা হয়েছিল ১২৯৮ সালে। এঁর দ্বিতীয় পুস্তিকা 'মহম্মদী বেদতত্ত্ব'-ও (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১০) পদ্যে লেখা।

সূফী-সাধক ও দরবেশ বাউলদের মাহাত্ম্য মুসলমান জনসাধারণের মন থেকে মুছে দেবার চেষ্টা হতে লাগল উনবিংশ শতকের শেষ থেকে কোন কোন কেতাবি লেখকের দ্বারা। এমনি একখানি বই মোহাম্মদ হাদেকের 'জালালাতল ফোক্‌রা'। লেখকের মতে

> বে-সরাহ ফকিরে দেশ ধ্বংস করে দিল
> তামাম লোকেরে তারা গোমরাহ করিল।

রঙ্গপুর-মিঠাপুকুর-শীতলগড়ি নিবাসী এনাতুল্লা সরকারের 'ফকিরবিলাস' (রচনাকাল ১২৯৯) মারফতি সওয়াল-জওয়াব বিষয়ে ভালো বই।

২০

শাড়ি, জারি, নাটগীত

বাংলাদেশের পুরানো নাটগীত-রীতির বিশুদ্ধ লৌকিক রূপটি মুসলমান জনগণের মধ্যেই যথাসম্ভব অবিকৃত ছিল সেদিন অবধি। পুরাতন 'নাটুয়া'-র আধুনিক উত্তরাধিকারী 'নেটো' পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদেরই একচেটে ছিল। 'শাড়ি' (এখন যাকে 'সারি' বলা হয়) গান বিগত শতকের আগেই পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। ইসলামি "সারি" গানের একটি খাঁটি নিদর্শন উদ্ধৃত করছি।[১]

> আল্লার হুকুম ভাই সাহেব দুনিয়া ভরি
> ওকে খোদার দোস্ত মহম্মদ করিল জারি।
> দুনিয়াত হইল পয়দা ঈশা পেগাম্বর
> ইঞ্জিল নামে যাহার কেতাব ফেরেঙ্গির আদর।
> বহুৎ বহুৎ পেগাম্বর দুনিয়াত পয়দা হৈল
> আল্লার কুদরতে মক্কায় মহম্মদ জন্মিল।
> মহম্মদ মদিনা সহরে বাদশা হয়েছিল
> বন্দার খয়রাফিয়তে কোরান বানাইল।
> ভেস্তে যদি যাইবে কোরানের কথা ধর
> এক চিত্তে পাঁচ ওক্ত নেমাজ পড়।
> কালামাল্লা পড় ভাইরে গোছল করিয়া
> জুম্মার নেমাজ পড় সকলে মিলিয়া
> ফজরের নামাজ পড় সাহেবিনীর সহিত
> নহে দিবা নহে রাত্র কোরানের লিখিত।
> ত্রিশ রোজা কর এক-দিল এক-জ্ঞানে
> হরদমে আল্লার নাম জপ মনে মনে।

---

১ ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী (১৩০১) পৃ ৩৫০-৫১।

যেই জনে মহম্মদের তরিক্ না মানিবে
কাফের হইয়া সে যে দুজকে যাইবে ॥

পূর্ববঙ্গের চাষী-মাঝিদের মধ্যে একদা মধুমালার গান খুব চলিত ছিল। এ গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাটিয়ালী স্বরমাধুর্য্য। মধুমালার গানের একটি প্রামাণিক সংক্ষিপ্ত রূপ উদ্ধৃত করছি।

মদনকুমার : আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখ যে ॥
আমি, পহেলা শিকারে এলাম
জঙ্গল মাঝে শুয়ে রইলাম
গো লোকজন।
আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখ ॥

[গায়ক] মদনকুমার যাত্রা করে
রানী কেঁদে ভূমে পড়ে
গো লোকজন ॥

মদনকুমার : ওরে, স্বপ্ন যদি মিথ্যা হবে
গলার হার কেন মোরে দিবে
আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখ রে ॥

মদনকুমার : কোথায় থেকে কোথায় এলেম
মাস্তুল ভেঙ্গে জলে পড়লেম গো লোকজন
আমি কবে দেখব মধুমালার মুখ হে ॥

লস্কর : কেঁদনা কেঁদনা কুমার
কেঁদনা আর হে তুমি
তুমি যেয়ে দেখবে মধুমালার মুখ হে ॥

মদনকুমার : কোথায় আমার ঘরবাড়ী
কোথায় আমার টাকাকড়ি গো লস্কর
আমি কবে দেখব মধুমালার মুখ হে ॥

মদনকুমার : এই না জলে শুয়ে ছিলেম
কোথা হতে কোথা এলেম গো লোকজন
আমি কবে দেখব মধুমালার মুখ হে ॥

মদনকুমার : সোনার পালঙ্কে কে গো
মিশিয়া আমার সঙ্গে গো ধনী
আমি কবে দেখব মধুমালার মুখ হে ॥

মধুমালা : কোথায় আমার ঘরবাড়ী
কে শুয়ে পালঙ্ক পরি গো সখি
আমি চিনতে নারি এ যুবকে সখি রে আমার ॥

মধুমালা : ত্যজিয়া আপন ভূমি
সোনার খাটে আছ গো তুমি গো বল্লভ
তুমি উঠে কথা বল বল পরান আমার ॥

মদনকুমার : কার কন্যে মহীধন্যে
এথা তুমি কার জন্যে গো পরান
তুমি একা কেন বাগিচাতে শয়ন পরান ॥

মধুমালা : না জানি না জানি আমি
তুমি কি গো মম স্বামী গো বল্লভ
আমি নবীন রূপের ডালি দেখে চিনিয়াছি হে ॥

মদনকুমার : যে আশাতে আমার আশা
তুমি তার আশার বাসা গো পরান
আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখ হে ॥
মদনকুমার নাম ধরি
স্বপনে তোমারে হেরি গো পরান
আমার একদিন সাক্ষাৎ যে ছিল গো পরান ॥
আমার হাতের এই অঙ্গুরী
চেয়ে দেখ ও সুন্দরী গো পরান
ঐ না আছে তোমার হাতে পরান ॥
তোমার গলায় হার দিলে
সেই হার আমায় গলে গো প্রিয়ে
প্রত্যয় দেখে হবে কিনা তোমার হে ॥

[গায়ক] সুখের তরঙ্গে ভাসে
মুচকি মুচকি হাসে গো কন্যা
জানলেম তুমি আমার পরান-পতি হে ॥

শুভদিন শুভ যোগে
নব প্রেম অনুরাগে গো লোকজন
তখন মধুমালা স্বয়ংবরা হইল হে ॥

মদনকুমার-মধুমালার কাহিনী নিয়ে লেখা বইয়ের আলোচনা আগেই করেছি।

"ভাটীয়ালী" দেহতত্ত্ব-গানের দুটি নমুনা দেওয়া হইল।

ভবের বাজার ভেঙ্গে গেল রে মন আমার
ও তুই ভবের হাটে কি করিলি বেপার।

খোদা যখন শুধাইবে
তুই তখন কি জবাব দিবে
শাস্তি হলে কি ভেস্তে পাবে ভেলকী দুনিয়ার।

লেড়কা লেড়কি কবিলা খসম
কেউ ত মন রে নয় রে আপন
একা আলি একা যাবি ভোজের বাজি এ সংসার।

যদি করতে চাইস ফতে
তবে চল ধরম পথে
খোদাতাল্লার কুদরতে খএর হবে তোর এবার ॥

মুস্কিদ আমার বানিয়া রে সাধ কর ব্যাপার
বিনা পাল্লায় বিনা ডাণ্ডি তুলেছে সংসার।
পুষ্করিণীর চারি পাড়ে নানা পক্ষীর বাসা
ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে ঐ আল্লার তামাসা ॥
আল্লা রইল হালে রে রছুল পয়গম্বর
ডাইন চোখে কি কইতে পারে বাঁও চোখের খবর।
এই লহর দরিয়ার মধ্যে বিষম যমের থানা
নেকি বান্দা পার হইবে যদি যাইতে মানা
(ভাঙ্গা ফিরে পানা)

কেমন মগদে বলে এ তত্ত্ব আপনা।
ভুখারে দিও ভাত তিয়াইসেরে পানি
নেংটারে দিও বস্ত্র ভেস্তের নিশানি ॥

কারবালার করুণ কাহিনী 'জারি' পালা-গানের বিষয়। এই গান এখন পূর্ববঙ্গেই শোনা যায়। কিন্তু একদা পশ্চিমবঙ্গেও এ গান অজ্ঞাত ছিল না। জারি গানের এই সব চেয়ে পুরানো নমুনাটি পশ্চিমবঙ্গের পুথিতেই মিলেছে।[১] দুঃখের বিষয় পুথিটি খণ্ডিত।

শ্রীশ্রীএলাহি

তারে নারে নারে নারে নারে নারে না ॥
কারবালাতে যখন হোছেন খলখয়ে শহীদ হল
হোছেনের শির নিয়ে কাফের দামেস্কাবাদে এল।
ছের নিঞে ত কাফের গেল নেজায় চড়িঞা ॥
কারবালাতে হোছেনের ধড় থাকিল পড়িঞা ॥ ১ বন্দ ॥

আবেদিনে তউক দিঞায় দিলেক উটের সহর
বিবিদের সব চাদর ছিনে করিলেক সওার।
পরিবারকে........................ধরিয়া
দামেস্কাতে রাখিলে কারাগার দিঞা ॥ ২ বন্দ ॥

পরিবার রহিল তামাম দামেস্কায় কয়েদ হঞা
মদিনার কথা কিছু শোন তোমরা মন দিঞা
হোছেনের বেটি ছোগরা ছিল মদিনায় হঞে উদাস
একেলা ছিলেন বিবি কেউ ছিল না তাহার পাশ ॥ ৩ বন্দ ॥

রাত দিন ছিলেন ছোগরা দরজার চৌকাট ধরে
যতেকও নেগাহে যেত শুধাইতেন কেন্দে তারে।
কোথা হতে এসে তোমরা কোথা যাহ চলিয়া
দেখেছ কেউ আনাত্তে মোর বাবাজীকে ফিরিয়া ॥ ৪ বন্দ ॥

[১] বিশ্বভারতীর পুথি ৩১২। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল সঙ্কলিত 'পুথিপরিচয়' (বিশ্বভারতী ১৩৫৮) পৃ ১৭৩-১৭৪ দ্রষ্টব্য।

বাবাজীর লাগিয়া ছোগরা হরঘড়ি করেন কহর
রাহা বিচে কেহ এসে কহিলেক এই সব খবর।
তোমার [পি]তা কারবালাতে পানি বিন বৈতার হয়া
মারা গেলেন কারবালাতে তামাম ফৌজেরে লঞা ॥ ৫ বন্দ ॥

এতেক শুনিল ছোগরা যখন তাহার জবানি
কহর মাতম করে বিবি ছের ঠুকে আপনি।
..............ছিলেন বিবি মহা···f···ওদাস

ছোগরা বিবির কান্দন শুনে আইলেন তাহার পাশ ॥ ৬ বন্দ ॥
ছোগরাকে দেখিলেন জেঞে ধুলায় আছে পড়িঞা
গাএর ধুলা ঝেড়ে ছোগরাএ নিলেন কোলে উঠাইঞা।
মু ধরে পুছেন ছোলমা ছোগরাকে তখন কথা
কিসের লেগে কান্দ তুমি জমি[নে] ঠুকে মাথা ॥ ৭ বন্দ ॥

গাএ দস্ত ফেরাইঞে ছোগরারে করেন চেতন
কহর মাতম করে ছোলমা ছোগরাকে শুধান তখন।
কিসের লেগে কান্দ তুমি কেন ধুলায় [পড়িঞে]···

যাত্রা-পালার একটি পুরানো রূপ পাই 'মোনাই যাত্রা'-য়। বইটিতে আধুনিক সম্পাদনার চিহ্ন অসুলভ নয়, এবং সঙ্কলয়িতাও এক ব্যক্তি নন। তবুও এর মধ্যে ছড়া-বোলান-কথা-গান সমন্বিত পুরানো ভঙ্গিটিকে ভেঙ্গে চুরে আধুনিক "গীতাভিনয়"-এর পর্যায়ে আনবার কোন চেষ্টা নেই। গল্পটিতে রূপককাহিনীর বিশেষত্ব আছে, এবং ময়নামতী গোপীচন্দ্র কাহিনীর প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়।

বল্খের শাহার সুখের রাজ্য। পত্নী চন্দ্রভানু, পুত্র মোনাই ও তোনাই (অর্থাৎ মন ও তনু)। এক দাসীর প্রতি তিন তিন বার নিষ্ঠুর আচরণের জন্য শাহার মনে নির্বেদ হয়। এক ফকীরের সংস্পর্শে এসে শাহা রাজ্য ত্যাগ করে বৈরাগী হয়। ছোট ভাইয়ের নির্বন্ধে ও মায়ের আজ্ঞায় মোনাই পিতৃ সিংহাসনে বসল। মায়ের অনুরোধে সে দরবারে সন্ন্যাসী-ফকীর-দরবেশের প্রবেশ নিষেধ করলে

আইলে কোন ঋষি মুনি
ভাঙ্গব তার মাথা অমনি

বল্খ-রাজ্যে এমন অবিচার আল্লা বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি এক ফেরেস্তাকে পাঠালেন ফকীর সাজিয়ে মোনাইয়ের দরবারে। মোনাই তাঁর প্রবেশ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। ফকীর মোনাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নিলেন সে যেন বাদশাহি ছাড়ে। মোনাইয়ের মায়া কাটেনি, সে মা-ভাই-স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে ব্যথা বোধ করলে। ভাইয়ের কাতরতা মায়ের ব্যাকুলতা যদিও বা ব্যর্থ হল, ভার্যা তারাবানুর কথা ঠেলা গেল না। মোনাই দেশে রয়ে গিয়ে নির্জনে তপস্বীর মত ফকীরের সঙ্গে থেকে বার বছর শাস্ত্র শিক্ষা করতে লাগল।

শিষ্যগুরুর সওয়াল-জওয়াবের নমুনা

মোনাইর ছওয়াল

পালন করেন কোন মুরশিদ বল তাহা মোরে
কাছাড়িল কোন মুরশিদ মোর তরে মারে।
কোন মুরশিদ জোটে ছোট হয়তো আমার
পাওতলে কোন মুরশিদ রহে কহ তত্ত্বসার ॥

সাঁইজির জওয়াব

মা মুরশিদ লালন পালন তোমায় কৈল
সে মুরশিদ তব পিতা কাছাড়ে মারিল।
জোটের ছোট ছোট ভাই মুরশিদ তোমার
জমিন মুরশিদ পায়ের নীচে কৈনু সমাচার ॥

বার বৎসরে মোনাই অধ্যাত্মবিদ্যায় পোক্ত হল। তখন গুরু তাকে ফকীরি নিতে বললেন। মোনাই বললে, বার বছর মাকে দেখিনি, আজ্ঞা করুন একবার দেখে আসি। ফকীর বললেন, তোমাকে ঘরে যেতে দিতে মন সরে না, কি জানি মায়ায় বদ্ধ হয়ে ফিরে আস কি না আস। তখন মোনাই সত্য করলে।

সত্য কৈনু জান তুমি
কাল প্রভাতে আসব আমি।

বার বছর পর ছেলেকে দেখে চন্দ্রভানু উল্লসিত হল। ছেলেকে আর যেতে দিতে চান না। মোনাই বললে, একটিবার যেতে দাও, আমি সত্য করে এসেছি ফিরব বলে। আবার ফিরে আসবে বলে স্বীকার করায় মা ছেলেকে ছেড়ে দিলে। ফকীরের কাছে মোনাই এসে দেখলে তিনি বসে কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করায়

ফকীর বললেন, তিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে মোনাইয়ের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হতে আর দশ দিন বাকি আছে। মোনাই বললে, তাহলে হুকুম দিন

আমি মায়ের কোলে যাব
জন্মের মত বিদায় লব।

মোনাইয়ের ম্লান মুখ দেখে মা কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মোনাই বললে

মা জননী কি বলিব
জন্মের মত বিদায় হব।

মায়ের কোলে শুয়ে মোনাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

উত্তর-বঙ্গে প্রচলিত যোগী-কাচের সঙ্গে[১] মোনাই-যাত্রার খানিকটা মিল আছে। তবে যোগী-কাচ যেমন গুরুশিষ্যসংবাদ-সর্বস্ব মোনাই-যাত্রা তেমন নয়। যোগী-কাচে গল্প বলে কিছু নেই, উপরন্তু আছে মূর্খ শিষ্যের ভূমিকার সাহায্যে হাস্যরসের যোগান। মোনাই-যাত্রায় এ রসের একান্ত অভাব।

[১] দ্রষ্টব্য 'বড় যোগীকাছ' রহিমউদ্দিন মুনশী সঙ্কলিত (১৩২১)।

২১

দম-মাদার ও কালন্দর-পন্থ

আল্লার প্রিয় ফেরেস্তা ছিল হারুত আর মারুত। এরা "যত কিছু ভেদ কথা ভাল আর বুরা" আল্লার দরগায় নিবেদন করত। একদা এদের খেয়াল হল আদম হাওয়ার সম্পর্ক কেমন তা জানতে। এ কৌতূহলের প্রশ্রয় আল্লা নিষেধ করলেন। তারা আবদার ছাড়লে না। তখন আল্লার ফরমানে ফেরেস্তা দুজন আশমান থেকে জমিনে পড়ল।

হারুত হইল মরদ মারুত আওরত
দুইজনা জরু খছম হইল খুবছুরত।
আওরত মরদের যেমন বেভার পুসিদায়
সেইরূপ বেভার করেন দুজনায়।

আল্লার হুকুমে মারুতের গর্ভ হল কিন্তু তা মোচন আর হয় না। তখন মুস্‌কিলে পড়ে তারা আল্লার নাম করে গড়াগড়ি কাঁদতে লাগল

খারাব হইনু মোরা আপনার দোষেতে
দোজখে পড়িয়া মোদের হইল জ্বলিতে।

ঈশ্বরের তখন দয়া হল।

মগরবের ওক্তে হুকুম হৈল ফেরেস্তায়
আচ্ছা করে বান্ধ কসে মজবুত দোহায়।
তামাম মুছল্লিগণ নামাজ পড়িলে
সেই ওক্তে বান্ধিবে সে রসি দিয়া গলে।
মজবুত করিয়া জিঞ্জির হাতে পায়ে দিবে।
দুইজনা এক সাতে মড়ম্বা করিবে।

বাঁধবার হুকুম শুনে ভয়ে মারুতের গর্ভপাত হল। নবজাত শিশুকে মাদার গাছের তলায় ফেলে রেখে হারুত-মারুত গায়েব হল। হজরত আলী শিকারে এসে গাছতলায় রূপবান্ ছেলেটিকে পেয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়ে বিবি ফতেমাকে

দিলেন মানুষ করতে। মাদার-তলায় কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে বলে নাম হল মাদার দেওান বা শাহ মাদার।

পাঁচ সাত বছর বয়স হল। মাদার খেলা করে বেড়ান রাখাল ছেলেদের সঙ্গে। একদিন রাখাল ছেলেরা মাদারকে বললে, আজ বড়-পীরের শির্নি হবে। মাদার জিজ্ঞাসা করলেন, বড়-পীর কে? রাখাল ছেলেরা বললে, তার নাম করতে নেই, "লেওা মাত্রে নাম গর্দ্দান জুদা যে হইবে"। মাদার বড়-পীরের কাছে গিয়ে বললেন, এস তুমি বড় কি আমি বড় পরীক্ষা হোক।

> আচ্ছা ভাই এইখানে সিরনি রাখিয়া
> আমরা তকরির করি একত্রে মিলিয়া।
> সত্ত একবার তুমি করো মোর সাতে
> হারিলে গর্দ্দান জুদা নাহি হবে তাতে।

বড়-পীর বললেন, বেশ, "কি কাম করিবে তুমি বল বোঝাইয়া"।

> মাদার বলেন ভাই লুকোচুরি খেল
> বোঝা যাবে এইবার হইলে কামেল।

বড়-পীরের আগে লুকোবার পালা।

> বড় পীর আখেরেতে আজিজ হইয়া
> নজর হইতে কোথা গেল ছেপাইয়া।
> দরিয়াতে মাছের যে আণ্ডার ভিতরে
> কুসুমের ভিতরেতে ছেপায় জহুরে।

মাদার ধ্যানে জেনে বড়-পীরকে ধরে ফেললেন। তারপর মাদারের পালা। মাদার চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে বড়-পীরের শ্বাসে ঢুকে গেলেন। পাহাড়-পর্বত ঢুঁড়ে মাদারের সন্ধান না পেয়ে বড়-পীর বললেন, "হারিনু তোমার কাছে কোথা আছ বল"। অশরীরী মাদার বললেন

> হাওা ভরে ছেপাইনু নিশ্বাস টানিতে
> হাওয়ার সামিলে আছি তোমার দমেতে।

তারপর বড়-পীরের মূর্ধা ভেদ করে মাদার বাইরে এলেন।

> আখেরেতে মস্তক হৈতে খেচিয়া উঠিল
> আজ তক সেই জায়গা খালি যে রহিল।

> ছেরের মদ্ধিখানে যাকে ব্রহ্মতালু বলে
> দেখিবে খেয়াল করে বলিনু সকলে।
> লাড়কার মালুম হয় হাড় নাই তায়
> ধুকধুক করে সেথা সদা সর্ব্বদায়।
> খেচিয়ে উঠিল মাদার ব্রহ্মতালু হৈতে
> দম মাদার রলিয়া নাম রহিল দুনিয়াতে।
> দমেতে খেচিয়া মাদার দম মাদার হৈল
> কালে কালে সেই নাম জাহের রহিল।

লুকোচুরি খেলায় বড়-পীর হেরে গেলে মাদার বললেন

> আচ্ছা ভাই এই তক হাছেল কালাম
> ঝগড়া মিটিয়া সিন্নি করহে তামাম।
> নাপাকিতে যে জন নাম লইবে তোমার
> গরদানের পশম এক কাটিবে তাহার।

কবি বলেছেন যে এই থেকে দুনিয়াতে লুকোচুরি খেলার চল হল,

> লাড়কারা আজ তক খেলে লুকোচুরি
> লাড়কার মজলেছে ভাই আছে ত মাস্থুরি।

একদিন বাড়ির বাইরে মাদার খেলছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন বিকটাকার যমদূতকে ("মালেকল মওত")। মাদার তাকে নাস্তানাবুদ করে এক মৃতের জান কেড়ে নিলেন। মালেকল মওত জীবরিলের কাছে গিয়ে মাদারের অত্যাচারের কথা জানালে। জীবরিল এজরাফিলকে পাঠালেন মাদারের কাছে তাকে বুঝিয়ে বলতে,

> তরস্ত যাইবে তুমি না করিবে হেলা
> বুঝাইয়া বলিবে তুমি বসিয়া নিরালা।

এজরাফিল ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে আল্লার কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন। তখন পাঠানো হল মেকাইল ফেরেস্তাকে। তাঁকে দেখে মাদার আগুনের মত জ্বলে উঠে বললেন

> যাও যাও মেকাইল না শুনিব কথা
> তোমার কি ধার ধারি কাম নাহি হেথা।
> ছামনেতে নাহি কাহো বলিনু তোমারে
> যাহার লিয়েছি জান সে বুঝিবে মোরে।

তারপর গেলেন আজ্‌রাইল। তাঁর দৌত্যও ব্যর্থ হল। তারপরে গেলেন বিবি ফাতেমা, দু' ইমাম হাসন ও হোসেন, হজরত আলী, হজরত নবী। "তারপরে আইল দেখ আপনি ছোবহান"। তখন মাদার তাঁর মনের সংশয় আল্লাকে জানালেন, "আবদুল্লা আমিনা কেন দোজখ মাঝারে"।

আল্লা মাদারকে তত্ত্বকথা শোনাতে লাগলেন।

> এক এক করিয়া কত বোঝায় খোদায়
> কিঞ্চিৎ বুঝিল মাদার বসিয়া তথায়।
> মাদার বুঝিয়া তখন খামস হইয়া
> জান লিয়া দিল তখন হাতেতে সুপিয়া।
> দুই হাত জুড়ে করে আরজ হুজুরে
> বড়ই করেছি গোনা নাহি চিনে তোরে।

আল্লা খুশি হয়ে বললেন

> তোমার কথার জেদ বাহাল রাখিয়া
> গোনাগার বান্দা সবে খালাছ করিয়া।
> আবদুল্লা আমেনা বাকি যেবা যতো আছে
> উম্মতের মধ্যে গোনা যে জন করেছে।
> সকলকে মাফ দিলাম তোমার কথায়
> বেহেস্তে দাখিল আমি করিব নিশ্চয়।

মাদার পুরুষও নন স্ত্রীও নন, "না মরদ আছে না আওরতের নেসানি"। মাদারের আহার নেই, নিদ্রাও নেই। তিনি জিন্দা শাহ মাদার, "দমের মাদার"।

শাহ মাদারের কাহিনী সংগ্রহ করে লিখেছেন ছায়াদ আলি খোন্দকার (১৩১৭)। লেখক ভক্ত মানুষ ছিলেন। তার পরিচয় এই প্রার্থনায়

> সকলের বাবে আল্লা করুক ভালাই
> তার পাছে মেরা তরে যা করেন সাই।

কালন্দর-পন্থও তাঁর অপরিচিত ছিল না।

> আউওল মোকাম এই ছেরকে জানিবে
> তাহাতে রৌশন এই দেখিতে পাইবে।
> দেলে দেলে এই জেকের হামেসা যোগায়
> শুন বাবা খেয়াল কর বলি সে তোমায়।

> যখন দেখিবে বাবা নয়নের পানি
> রহমত হইবে বাবা শুন মেরা বাণী।
> দুই দরজার বিচে আজরাইলের আসন
> হু হু আওাজ তাতে ওঠে সর্বক্ষণ।
> জাগন্ত ঘোমন্ত তাতে একই সমান
> নিরক্ষণ করিয়া বাবা দেখিবে নিদান।
> দেলে জানে এক জবে হইবে তোমার
> দেখিতে পাইবে বাবা অন্দর বাহার।...
> দুনিয়ার চক্ষু যখন মুদিত করিবে
> গোপনের চক্ষু হৈতে সব দেখা পাবে।
> গন্ধ সুবাস দেখ গোপন হৈতে রয়
> ছামনের চক্ষু দেখ ছামনে দেখায়।
> পৃষ্ঠেতে কি আছে তাহা না পায় দেখিতে
> অন্ধকার ধন্ধকার দিয়াছে দেখিতে।
> দোছরা মোকাম বাবা দেখ ঠাহরিয়া
> নাভিস্থল সে মোকাম দেখ বিচারিয়া।
> নজর কর নীচে দেখ জলে ঐ বাতি
> সে মোকামে যাইবে যখন কেহ নাহি সাতি।
> দুখ সুখ খেয়ে বাবা যদি পার যেতে
> নিরাঞ্জন কর্তা বসে আছেন তাহাতে।
> রুহের ঘরেতে আপন দমকে রাখিবে
> রঙে রঙে সব ঘরের দুওার খুলে যাবে।
> এস্কের আগুন যখন দ্বিগুণ জলিবে
> সে ঘরে আল্লার সাথে সাক্ষাত হইবে।
> ছালেক হইবে যদি সিধা রাস্তা ধর
> মোরসেদের ছুরত তেরা দেলের ভিতর।
> তার পরে ফানা যবে আল্লাকে জানিবে
> তিন রূপে এক রূপ মিশিয়া যাইবে।

মনছুর হাল্লাজ যেমন নেস্ত হইয়া
কিবা মছিবত লিল জানেতে সহিয়া।
তবে তার মতলব বাবা হাছেল হইল
আয়নাল হক বোল মুখে সদত উঠিল।
শূলি পরে খেচা গেল মালুম না ছিল
আয়নাল হক বোল যে নাহিক থামিল।
আপনার দুই চক্ষু আপনি মুদ্দিবে
বাতুনের চক্ষু খুলে আপনি দেখিবে।
সেই দেলে দুই চক্ষু যখন মেলিবে
আল্লার রূপে তখন আপনি মিশে যাবে।

সুফীমত ও যোগসাধনের এ এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। সিদ্ধাচার্যদের উক্তির সঙ্গে মাঝে মাঝে আশ্চর্য মিল আছে। যেমন

এ মোকামে যাওয়া বাবা বড়ই কঠিন
ডাইনে বাঁয়ে খেয়াল করে দেখিবে মমিন।

২২

ইসলামি বাংলা

ইসলামি বাংলা বলতে এখন যা বোঝায় তার সৃষ্টি হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। তার আগে মুসলমান লেখকেরা সাহিত্যে যে ভাষা ব্যবহার করতেন তা ছিল সাধুভাষা। তবে তার মধ্যে অল্পবিস্তর আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার ছিল। এই সকল শব্দের কতকগুলি মুসলমান জনগণেরই সুপরিচিত, বাকি গুলি তখনকার হিন্দু-মুসলমানের কাজের ভাষার সাধারণ সম্পত্তি ছিল।

কেজো বাংলা গদ্যে আরবী-ফারসী শব্দের চলন গোড়া—অর্থাৎ যখন থেকে বাংলা গদ্যের নিদর্শন মিলছে তখন—থেকেই আছে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের সংস্কৃতবহুল পত্রে পাই ফারসী 'সিতাব' ("চিতাপ")। একশত বছরের মধ্যে পত্র-দলিলের ভাষায় এই প্রভাব যে কতটা বেড়ে গিয়েছিল তার নিদর্শন পরের পাতায় মুদ্রিত প্রতিলিপিতে মিলবে। আরো এক শ বছর পরে এই ভাষা যে তথাকথিত ইসলামি বাংলার কতটা কাছে এসেছিল তার নমুনা ওলন্দাজ কোম্পানির ডিরেক্টরের কাছে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হরিমোহন শর্মার আর্‌জি থেকে উদ্ধৃত করছি।[১]

শ্রীযুক্ত ওলন্দেজ কোম্পানিতে আড়ঙ্গ বিরভূমের গঞ্জে খরিদের দাদনী আমি লইয়া টাকা আড়ঙ্গ চালানী করিয়াছি আপরেল মাহাতে এবং মোকাম মজকুরের গোমস্তা কাপড় খরিদ করিতেছিল এবং কাপড় কথক ২ আমদানী হইয়াছে এবং হইতেছিল দাস্ত কথক ২ তইয়ার হইয়াছে এবং মবলক কাপড় ধোবার হাতে দাশতর কারণ রহিয়াছে তাহাতে সংপ্রীতি মেঃ গেল সাহেবের তরফ পেয়াদা আসিয়া খামখা জবরদস্তী ও মারপিট করিয়া ঘাট হইতে ধোবা লোককে ধরিয়া লইয়া গেলো আমার তরফ গোমস্তা ও পেয়াদা জাইয়া সাহেব মজকুরকে জাহির করিলো তাহা সাহেব গৌর না করিয়া আমার লোককে হাকাইয়া দিলেক এবং কহিলেক পুনরায় তোমরা আইয়াছ সাজাই দিব আমার কমবেষ ৪০০০ চারি হাজার থান কাপড় ধোবার ঘাটে দাস্ত বেগর

[১] সুরেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র-সঙ্কলন' পৃ ৩।
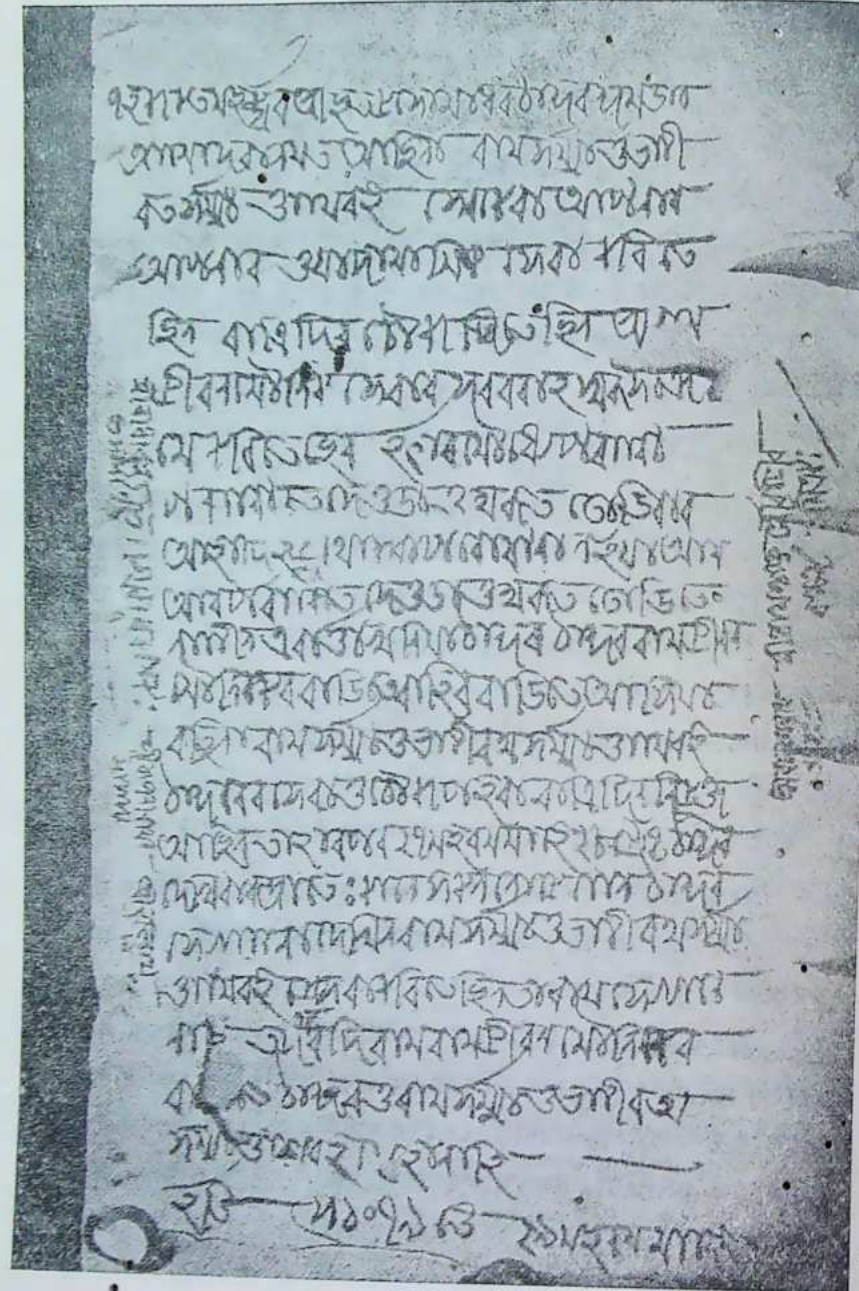
পচিতে লাগিল ইহা:সেওয়ায় কোরা কাপড় কাচীতে তইয়ার অতএব আরজ ইহার তদারক মেহেরবানী করিয়া করিতে হুকুম হয়……

পূর্ব্ব এই সকল দৌরাত্তী কারন মহাজনান আরজি দিয়াছিল তাহার জবাব মেলে নাই অতএব আরজ সাহেব আমাদিগের মালিক জাহাতে ত্বরায় আড়ঙ্গ খোলাসা হয় এমত করিতে হুকুম হয়।

এর মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় শব্দ ফারসী '-আন' বিভক্তি যোগে বহুবচন "মহাজানান"।

পুরানো বাংলায় সাহিত্যরচনা হত পদ্যে। পদ্যের ভাষা প্রাচীনত্বের অনুসরণ করে থাকে। আর তাতে সংস্কৃতের প্রভাব বরাবরই বর্তমান। কিন্তু সেখানেও কথ্যভাষায় প্রচলিত বিদেশী শব্দের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ হয় নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ফারসী 'মজুর' আছে, তার থেকে বাংলা প্রত্যয় যোগে তৈরি 'মজুরিয়া'-ও আছে। গৌণকর্মবাচক অনুসর্গরূপে 'বরাবর' শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে মিলছে। ষোড়শ শতাব্দীর একাধিক উল্লেখযোগ্য রচনায় বিদেশী শব্দ থেকে নামধাতু সৃষ্ট হয়েছে: বদল থেকে 'বদলিয়া', কুলুপ থেকে 'কুলুপিল' (বিশেষণ)।

হিন্দী শব্দ ও ইডিয়ম বর্জন করলে ইসলামি বাংলায় যে চেহারা হয় তার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের যে ব্যবহারিক বাংলা—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের সাধুভাষা নয়—তার সঙ্গে তফাৎ ছিল না বললেই হয়। এ গদ্যের নিদর্শন চিঠিপত্রে দলিলদরখাস্তয় যথেষ্ট মেলে। পদ্যের একটু দুর্লভ নিদর্শন দিই কর্তাভজাদের গান থেকে।

ভাই আমার আহয়াল কিছু শুন সব লোকে
কমিনে আর এমনত নাই মুলুকে
এক দফাতে ফাঁপর হয়েছি
তোফা এক খেপার সাথে পিরীত করেছি
আর সুখেতে ফারখতি মাত্র অনাহুত বদনামি।

এঁরা বাংলা গানে মুসলমান লেখকদের মত হিন্দীও চালিয়েছেন। যেমন

তোম জুদা হোকে খোদাই দরখ্‌ৎকা মেওয়া
না খায়া কেয়া কিয়া রে ভাই বরকৎ না হুয়া
আউর কিয়া পুছেঙ্গা জি হাম তোমে
আওনা আর যাওনা সেরেফ দুনিয়া কা বিচমে
সে দিতেছে সবারে দেখ চাহিতে না চাহিতে।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলা দেশে শাসন কার্যে ফারসীর স্থান নিলে বাংলা। সেই থেকে আরবী-ফারসী শব্দের আমদানী তো বন্ধ হলই উপরন্তু স্বল্পপরিচিত আরবী-ফারসী শব্দের নিষ্কাশন শুরু হল। বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রবর্তন হল সংস্কৃত-শিক্ষিতদের দ্বারা, আর গদ্য রচনারীতিকে রসান্বিত করলেন ইংরেজি-শিক্ষিতরা। এদিকে ফারসী-উর্দু-জানা-মুসলমান লেখকেরা পুরানো রাস্তা ধরেই চললেন। তার ফলে ইসলামি বাংলা সাধারণ সাহিত্যের ভাষা থেকে যেন দূরে সরে গেল।

এখনকার পাঠকের কাছে ইসলামি বাংলার বিশেষত্ব যা ঠেকে তা এইগুলি:

১. অপরিচিত আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য। যেমন,

তিন কেতাবের আলেম নহে সে জাহেল
সাতশো সাগরেদ তার তামাম ফাজেল।

এই পয়ারে বারোটি শব্দ আছে, ছটি বাংলা ছটি আরবী-ফারসী।

২. হিন্দী শব্দের বাহুল্য। যেমন, মুঝে, তুঝে, মেরা, তেরা, এত্তা, যেত্তা, এয়ছা, যৈয়ছা, তেয়ছা, আবি, ভি, তক (=পর্যন্ত), দোন, পাচঙা (=পঞ্চম), ছটঙা (=ষষ্ঠ), সাতঙা (=সপ্তম), চৌদা, মচ্ছর, বাত।

৩. আরবী-ফারসী শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার। যেমন,

গোজারিয়া (< গুজর) গেল রাত হইল ফজর; চলেন রাহার পরে খোশালিত (<খুশহাল) মন; সাতকোটি আল্লাতালা বক্সিল (<বখ্‌শ্‌) আমায়।

৪. হিন্দী ধাতুর ব্যবহার। যেমন,

এয়ছা ভাতে কতদুর নেকালিয়া (< নিকাল) যায়; কদমে গিরিছু (< গির) আমি; তুড়িবেক (<তুড়) দুনিয়ার কুফর কমজাত; হাতী ঘোড়া উট ভাগে ডালিয়া (< ডাল) ছওয়ারি; ঘোড়া থেকে কুদে (< কুদ) উঠে যেমন হাওাই; এয়ছাই খেচিল (< খেচ) জোরে আমিরের তরে, খেলাইল (< খিলা) খানা পিনা যেমন যাহার; চাকরি বাজাই (< বাজা) আর থাকি আনন্দিতে; আমীর মরদান পরে রহে ওতারিয়া (< উতার); খোশালিতে জরির পোষাক মাঙ্গাইয়া (< মাঙ্গা); জোরে লেজা ছাড়াইয়া ছের পরে ঘুমাইয়া (< ঘুমা) মারে মর্দ্দ বোরহানা উপরে; ভেজিয়া (< ভেজ) দিয়াছে লেখা হুজুরে তোমার; টাকা দিয়া দুখেরে দেলাব (<দেলা) আমি বিয়া॥

৫. বিবিধ বাংলা ও আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের অনুসর্গ ও উপসর্গ রূপে ব্যবহার। যেমন,

(ক) তরে (-রে বিভক্তির মত গৌণ ও মুখ্য কর্মে): আবু সামার তরে (=আবুসামাকে) কোথা না দিত ছাড়িয়া; ফাতেমা বেটার তরে (=বেটাকে) কোলেতে লইল।

(খ) বরাবর (উপমা অথবা গৌণ কর্ম বোঝাতে): হুর বরাবর (=মত) রূপ এমন সুন্দরী; গোস্বায় আমীর জলে আগ বরাবরি (=আগুনের মত)।

(গ) বিচ (সপ্তমীর অর্থে); আপন গড়ের বিচে রহে খোশালিতে; একেলা জঙ্গল বিচে কেহ নাহি সাথে।

(ঘ) খাতির (উদ্দেশ্য অথবা গৌণ কর্ম অর্থে): কি খাতেরে আইলে হেথা; পোঁছে শাহা বিবির খাতির (=বিবিকে); তারপরে পোছে বাত আমার খাতেরে (=আমাকে)।

(গ) হুজুর (গৌণ কর্মের অর্থে): খোশাল হইয়া কহে বাপের হুজুরে; তারপরে গেল ফের মায়ের হুজুরে।

(ঘ) হাজির (গৌণ কর্ম বোঝাতে): কহ বিবি আমার হাজির (=আমাকে)।

(ঙ) নজদিগ (গৌণ কর্মের অর্থে): আমার নজদিগে সবে আন বোলাইয়া।

(চ) সেওয়া ('বিনা' অর্থে): ইহা ছেওয়া যাহা চাহ দিব আমি তুঝে।

(জ) বেগর (উপসর্গ, 'বিনা' অর্থে): বেগর তহকিকে কেন মার জাহামীর।

৬. ফারসী বহুবচন 'আন' বিভক্তির ব্যবহার। যেমন, বনের বাঘওান, বন্দিয়ান (=বন্দীরা), বন্ধুয়ান (=বন্ধুগণ)।

সংযোজন

পৃষ্ঠা ৪৭। মোহম্মদ খাঁনের আর একটি রচনা হল ‘সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ’ বা ‘যুগ-সংবাদ’। পুথির লিপিকাল ১১৪৪ মঘী (=১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ)। রচনাকাল ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ, মুক্তাল হোসেনের দশ বছর আগে লেখা। আহমদ শরীফ লিখিত প্রবন্ধ (সাহিত্য-পত্রিকা প্রথম সংখ্যা ১৩৬৬) দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠা ৪৯। হামিদ লিখেছিলেন ‘সংগ্রাম-হুসন’ (অর্থাৎ হোসেনের সংগ্রাম)। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক লিখিত প্রবন্ধ (বাংলা একাডেমী পত্রিকা প্রথম সংখ্যা জানুয়ারী ১৯৫৭) দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠা ১৬৮। ‘কেয়ামত নামা’ অনুবাদ করেছিলেন “কারি” ব্রানউল্যা। পুথির লিপিকাল ১১৫৪ সাল (=১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ)। পত্র সংখ্যা ১০০। লিপিকর মনির মহম্মদ সাং গোপাল নগর পরগনা বামনডাঙ্গা। ব্রানউল্যার পিতার নাম শেখ মসএদ, মুর্শিদের নাম শেখ দিদার মামুদ। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৪ পৃঃ ৯০-৯১ দ্রষ্টব্য।

নির্ঘণ্ট

চিত্রাবলী

রাধাচরণ গোপের জঙ্গনামা

গাজীর পট

আশুতোষ মিউজিয়মে সংগৃহ

গরীবুল্লা-হামজার জঙ্গনামার একটি ছবি

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।
শরণং॥

গোলেবকাঅলি॥

অর্থাৎ॥

পারস্য বকাঅলি গ্রন্থ বঙ্গ
ভাষায় পয়ারাদি নানা ছন্দে
শ্রীযুক্ত উমাচরণ মিত্র তথা শ্রীযুত
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক বির
চিত হইয়া ইদানীং
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকারের
অনুমত্যনুসারে
শ্রীরামপুর।
চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।
সন ১২[illegible] সাল
ইং ১৮৪৩ সাল॥

গোলেবকাঅলির (১৮৪৩) নামপৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীঈশ্বর
বাহার দানেস এই
কেতাবের নাম।
তারি অর্থ বঙ্গলোক জানিবে তামাম।
কারছিতে মৌলবি এনাএতল্লা সাহেব তছনিফ
করেন ঐ কেতাব সাধুভাষায় রচিত।
ঢাকা নিবাসি মনসি মহাম্মদ মির্জান
জিয়াদের যত্নে রচিত হইয়া
দ্বিতীয় বার ছাপা
শ্রীযুত মহাম্মদ দেয়ানতুল্লা মহাশয়দি বত্তে
মদ্রাঙ্কিত হইল।
بحکم خادمین مولوی محمد فضل اللہ صاحب کے
اس کتاب کو من محمد رایت اللہ نے چھپوایا
এই কেতাব যাহার দরকার হইবেক তিনি মো
কাম কলিকাতার মিয়াজানদফ্তের মধ্যে শ্রী
কেতাবদ্দিন সরকারের বাটির
উত্তর অংশে
শ্রীযুত মহাম্মদ দেয়ানতুল্লার বাটিতে তত্ত
ক করে লইবেন।
সন ১২৫২ সাল তারিখ ৩১ ভাদ্র সোমবার

বাহার দানেসের (১৮৪৫) নামপৃষ্ঠা।